সম্পাদকীয়

এবারের বুলেটিনের প্রচ্ছদ 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি'। ৩১ অক্টোবর ২০১৭ ইউনেসকো বিশ্বের ৭৮টি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল, নথি ও বক্তৃতাকে এই স্বীকৃতি দেয়ার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে। তার মধ্যে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণে বলেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– একে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেসকো। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ভূমিকা ইতিহাসের বাঁকবদলের। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে দেশের আন্দোলনরত মানুষের কাছে বহু প্রত্যাশিত এ ঘোষণা, যা নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আলোকবর্তিকারূপে প্রতিভাত হয়েছিল। বাংলাদেশের জন্মের মধ্য দিয়ে এ ভাষণের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। এ যেন আবেগময় নিটোল এক কবিতা, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের মুক্তিগামী মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠতে পারে। ৭ই মার্চের বক্তৃতাকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ইউনেসকোকে।

সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে বিডিআর বিদ্রোহের মামলার হাইকোর্টের রায়। আসামির সংখ্যার দিক থেকে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হত্যা মামলা। ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে হত্যার দায়ে ১৩৯ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট। এ ছাড়া যাবজ্জীবন দেয়া হয়েছে ১৮৫ জনকে। আর ২০০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে এবং খালাস পেয়েছেন ৪৫ জন। শুরু থেকে এ হত্যাকাণ্ডকে ধিক্কার জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র। পাশাপাশি মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডকেও সব সময় নিরুৎসাহিত করে আসছে। ক্ষতিগ্রস্তরা সান্ত্বনা পান যে, তাঁরা একটি বিচার পেয়েছেন। অন্যদিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের পরিবার তাদের স্বজনদের কৃতকর্মের ভুক্তভোগী হয়ে থাকেন। এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ভবিষ্যতে এড়ানোর জন্য বাহিনীগুলোর গঠন ও এই ধরনের ঘটনা মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক কর্মকৌশল নির্ধারণের বিষয়ে সরকার ভেবে দেখতে পারে।

পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২০ বছর পূর্তি হলো সম্প্রতি। সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি এবং স্থানীয় পরিষদের হাতে চুক্তিতে উল্লিখিত কার্যাবলি হস্তান্তরের বিষয়ে এখনো তেমন অগ্রগতি নেই। এ কথা সত্য যে, পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য পার্বত্য চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

প্রতিবছরের মতো এবারও ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত পালিত হবে নারী নির্যাতনবিরোধী পক্ষ। তার মধ্যে আমাদের বলতে হচ্ছে যে, বাসে, বাড়িতে এমনকি বিদেশে শ্রম দিতে গিয়েও বাংলাদেশের মেয়েরা নিরাপদ নয়, যৌন নির্যাতন, হত্যার শিকার হচ্ছেন অহরহ। চলন্ত বাসে ধর্ষিত ও খুন হওয়া রূপার মামলা, মধ্যপ্রাচ্যে যৌন নির্যাতনের শিকার অভিবাসী নারী শ্রমিকদের দেশে ফেরা আর খুব কাছের মানুষের হাতে ধর্ষিত হয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ করার দুটি ঘটনা আলোচিত হয়েছে এবারের বুলেটিনে।

সম্প্রতি সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত জেনারেল রাটকো ম্লদিচ এবং স্লোবোডান প্রালজাকের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছেন। আদালতের এই রায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের নামে গণহত্যা পরিচালনাকারীদের জন্য একটি বার্তা হতে পারে। মিয়ানমারে চলমান রোহিঙ্গাদের নির্বিচারে গণহত্যার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের দাবি নানা মহল থেকে উঠে আসছে। অদূর ভবিষ্যতে এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সুবিচার পাবে আশা করি। ■

উপদেষ্টা সম্পাদক: হামিদা হোসেন, শীপা হাফিজা, এডভোকেট ইদ্রিসুর রহমান ❑ সম্পাদক: শাহীন আখতার
আইনগত সম্পাদনা: নিনা গোস্বামী ❑ প্রকাশনা সহযোগী: কানিজ খাদিজা সুরভী ❑ প্রচ্ছদ: মনন মোর্শেদ ❑ অঙ্গসজ্জা: মো. খায়রুল হাসান
অনিল চন্দ্র মন্ডল ❑ কম্পিউটার কম্পোজ: মো. মহসিন আলী ❑ ফটোগ্রাফ: আসক, ইন্টারনেট ❑ মুদ্রক: অর্ক

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি

মফিদুল হক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণে বলেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– একে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেসকো। ৩১শে অক্টোবর ২০১৭ সংস্থাটি বিশ্বের ৭৮টি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল, নথি ও বক্তৃতাকে এই স্বীকৃতি দেয়ার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে। এই স্বীকৃতি পেতে ইউনেসকোকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিল সরবরাহ করেছেন ফ্রান্সের প্যারিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মো. শহিদুল ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। এজন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ওই স্বীকৃতির সপক্ষে ১০টি প্রয়োজনীয় নথি, প্রমাণপত্র ও তথ্য জমা দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তথ্য মন্ত্রণালয় সহযোগিতা করে।

ইউনেসকোর আন্তর্জাতিক পরামর্শক কমিটি (আইএসি) 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' (এমওডব্লিউ) কর্মসূচির আওতায় ওই ৭৮টি দলিলের মনোনয়ন নির্বাচন করে। এই তালিকায় জায়গা পেতে হলে যে-কোনো ঘটনার তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক প্রভাব থাকতে হয়। এই তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে ইউনেসকো বিশ্বের বিভিন্ন অংশের ঘটনা সংরক্ষণসহ সবার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক ১লা নভেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রথম আলোকে বলেন, '৭ই মার্চের ভাষণকে ইউনেসকোর ঐতিহাসিক দলিলের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য আমরা দুই বছর ধরে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি সরবরাহ করেছি। এই ভাষণটি প্রাথমিকভাবে মনোনীত হওয়ার পরও আমরা ইউনেসকোর শর্ত অনুযায়ী তা গোপন

রেখেছিলাম। শেষ পর্যন্ত ওই সফলতা আসায় আমরা মনে করি, এত দিন বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের মুক্তিসংগ্রামের এক অনন্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত ছিল, এখন তা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক।'

৭ই মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি চেয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে ১২ পৃষ্ঠার আবেদনটি করা হয়েছিল, তাতে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বৈশ্বিক গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। তাতে বলা হয়, ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জ্যাকব এফ ফিল্ড বিশ্বের সেরা বক্তৃতাগুলো নিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থ বের করেন। উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস : দ্য স্পিচেস দেট ইন্সপায়ার হিস্ট্রি বইয়ে ৭ই মার্সের ভাষণকে বিশ্বের গত আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে যুদ্ধকালে দেয়া বিশ্বের অন্যতম অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তৃতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের আবেদনে আরো বলা হয়, ওই বক্তৃতার কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপি ছিল না। কিন্তু এই বক্তৃতার পথ ধরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে। জাতিসংঘে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হওয়া রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের বিষয়টি স্বীকৃতি পায়। বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জাতিগুলোর জন্য ওই বক্তৃতা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ্য যে, ইউনেসকো ১৯৯২ সালে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম চালু করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দালিলিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের তাগিদে এই কর্মসূচি চালু হয়। যুদ্ধ ও সামাজিক অস্থিরতা, সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে দালিলিক ঐতিহ্য সংকটে পড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন সংগ্রহশালা বিনষ্ট হয়েছে। লুটপাট, অবৈধ বিক্রি, ধ্বংস, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো ও তহবিলের উদ্যোগে নষ্ট হয়েছে দলিল। অনেক দলিল নষ্টের ঝুঁকিতে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষণের ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হকের বঙ্গবন্ধু ও ৭ই মার্চ নিয়ে লেখা একটি রচনা এখানে পত্রস্থ হলো। বর্তমান রচনাটি তাঁর 'পদানত জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের তাৎপর্য' শীর্ষক ২০১৭ সালের ১৬ই মে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা'র অংশবিশেষ।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালে গ্রামীণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম। একদা সমৃদ্ধিশালী এই পরিবার অতীত বিত্ত হারিয়ে ফেললেও স্বাধীনচেতা হিসেবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অধিকর্তাদের সঙ্গে নানাভাবে লড়াই করে চলেছিল। একদা বিত্তশালী ভূস্বামী পরিবার কালক্রমে সম্পদহারা হয়ে ব্যবসায়ী ও কর্মজীবীতে রূপান্তরিত হয়েছিল, কিন্তু প্রতিরোধচেতনা বংশপরম্পরায় বোধ করি তাঁদের ধমনিতে বহমান ছিল। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে পরিবারের এক ঊর্ধ্বতন পুরুষ কুদরতউল্লাহ শেখের সঙ্গে নীলচাষের কুঠিয়াল মিস্টার রাইনের বিবাদের কথা উল্লেখ করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান। মালামালবাহী নৌকার মাঝি-মাল্লাদের হেনস্তা করত কুঠিয়ালের লোক। তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ মামলা চালিয়ে শেষাবধি বিজয়ী হয়েছিলেন শেখ কুদরতউল্লাহ, আদায় করেছিলেন প্রতীকীভাবে হলেও আধা পয়সা জরিমানা, বিজয়ের সে গল্প অনেককাল ফিরেছে লোকের মুখে মুখে।[১]

শেখ মুজিবের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও রাজনীতিতে দীক্ষা কলকাতায়, সেখানে মুসলিম লীগের রাজনীতির কর্মী তিনি হয়েছেন বটে, তবে তিনি ও তাঁর সতীর্থরা সচেষ্ট হয়েছিলেন নবাবজাদাদের প্রাধান্য ঘুচিয়ে লীগের জনভিত্তি প্রসার করতে। শুরু থেকেই তাঁকে স্নেহ ও সমর্থন জোগাতে থাকেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পাশাপাশি মুজিব বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর। হাসপাতালে আটক সুভাষ বসুর সঙ্গে একবার দেখা করবার চেষ্টা নিয়েও তিনি সফল হননি। মুসলিম লীগের রাজনীতির সাম্প্রদায়িক দর্শন তাঁকে প্রভাবিত করেনি। হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের দিনগুলোতেও কোনো রকম সাম্প্রদায়িক চিন্তা তাঁর মনে স্থান পায়নি। সুভাষ-অনুরাগের একটি কারণ হয়তো সেটা, আরেক কারণ হতে পারে জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ের উদ্‌গাতা হিসেবে সুভাষ বসুর ঐতিহাসিক অবস্থান, যা অর্জন করেছিল আন্তর্জাতিক মাত্রা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা বিদায়ের আগে মুসলিম লীগের দাবি অনুসারে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত ভাগে উদ্যত হলে শরৎ বসু-সোহরাওয়ার্দী যৌথভাবে অখণ্ড বাংলার পক্ষে যে অবস্থান নিয়েছিলেন সেখানে সোহরাওয়ার্দী-অনুগত হিসেবে তরুণ মুজিবও যুক্ত ছিলেন। বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ধারণার সঙ্গে এটাই বোধ করি শেখ মুজিবের প্রথম সম্পৃক্ততা। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ দিল্লিতে মুসলিম লীগের কনভেনশন ডেকে যখন লাহোর প্রস্তাবের 'রাষ্ট্রপুঞ্জ' শব্দের পরিবর্তে 'একক রাষ্ট্র' গঠনের লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করেন তখন শেখ মুজিব এর বিরোধী পক্ষেই ছিলেন, যদিও জিন্নাহর প্রতি প্রবল উত্তেজক-সমর্থন সব বিরোধিতা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সোৎসাহী কর্মী ছিলেন না শেখ মুজিব। তাই দেখা যায়, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তিনি পাকিস্তানে আসেননি, ছিলেন কলকাতায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য সেদিন বেলিয়াঘাটার হায়দারি মঞ্জিলে অনশনব্রত পালন করেন মহাত্মা গান্ধী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সেখানে নেতৃদ্বয়ের সঙ্গে ছিলেন শেখ মুজিব। এরপর সেপ্টেম্বরে ঢাকায় আসেন তিনি। আত্মজীবনীতে লিখেছেন: 'আমি ভাবতাম পাকিস্তান কায়েম হয়েছে, আর চিন্তা কি? এখন ঢাকায় যেয়ে ল' ক্লাসে ভর্তি হয়ে কিছুদিন মন দিয়ে লেখাপড়া করা যাবে। চেষ্টা করবো, সমস্ত লীগ কর্মীদের নিয়ে যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা না হয়।'[২]

কলকাতা থেকে ঢাকা তথা পাকিস্তানে আসার পরপর প্রথম অশনিসংকেত শুনতে পান শেখ মুজিব যখন গণপরিষদে উর্দু-ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় বক্তব্য পেশের প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। জাতীয় অধিকার অস্বীকারের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিল থেকে গ্রেপ্তার হন শেখ মুজিব, ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে। মুক্তির পর আবারও গ্রেপ্তার হন বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলনের কারণে এবং

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভাষণরত বঙ্গবন্ধু

পরিণামে বহিষ্কৃত হন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

১৯৪৯ সালে প্রথমবারের মতো শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে যান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করে নবগঠিত দল আওয়ামী লীগ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য। লাহোরে শেখ মুজিব উঠেছিলেন প্রথিতযশা সাংবাদিক ও অভিজাত পরিবারের সদস্য স্বনামধন্য মিয়া ইফতেখারউদ্দিনের বাসায়। মিয়াসাহেব প্রকাশিত পাকিস্তান টাইমস-এর দপ্তরেও শেখ মুজিবের যাতায়াত ছিল এবং সেই সুবাদে লাহোরের উদারবাদী অভিজাত মহলের সঙ্গে মেশার সুযোগ পান তিনি। বামপন্থি কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ এবং সাংবাদিক মাজহার আলী খানের সঙ্গে সেবারই তাঁর পরিচয়, তাঁরা উভয়ে ছিলেন পাকিস্তান টাইমস-এর কর্মী। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর দীর্ঘ কারাজীবন শেষে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যান শেখ মুজিব। সেবারে তাঁর হয়েছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যেমন, লাহোরে তিনি ছিলেন আল্লামা ইকবালের বাসভবন 'জাভেদ মঞ্জিল'-এ। আওয়ামী লীগ তখন বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার দল হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ভাষা আন্দোলন সেই জায়মান সংগঠন ও চেতনার প্রতি জুগিয়েছিল বিপুল প্রণোদনা। পূর্ব পাকিস্তান কোন পথে যাবে, এমন জিজ্ঞাসা জেগে উঠছিল পশ্চিমের রাজনৈতিক মহলে। এই পটভূমিকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নবীন নেতা শেখ মুজিবের করাচি ও লাহোরে অবস্থান রাজনৈতিক মহলে সাড়া জাগিয়েছিল এবং পত্রপত্রিকাতেও তার প্রতিফলন মেলে। সেই সফরে তরুণ শেখ মুজিব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিধারা প্রভাবিত করার মতো বড় দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং দিয়েছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধির পরিচয়। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে এই মর্মে লিখিত পত্র গ্রহণ করেন। অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি বিষয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবস্থান নিয়ে এক ধূম্রজাল তৈরি করা হয়েছিল, সেটা দূর করার জন্য মুজিব তাঁর কাছ থেকে আরেকটি লিখিত বক্তব্য সংগ্রহ করেন। অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দী-মুজিব গুরু-শিষ্য সম্পর্ক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এক নতুন বিন্যাস তৈরি করছিল এবং এর প্রতিফলন আমরা এখানে পাই। শিষ্য যে গুরুকে প্রভাবিত করতে পারে, সেটা তখন বোঝা গিয়েছিল। এই গুরু-শিষ্য সম্পর্ক আজীবন বজায় রেখেছেন শেখ মুজিব, তবে স্বকীয়তা নিয়ে রাজনীতিতে অভিঘাত সৃষ্টির কর্মদক্ষতা তিনি তখনই প্রদর্শন করেছিলেন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুধাবনে শেখ মুজিবের গভীরতাসম্পন্ন দৃষ্টি ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় মেলে করাচিতে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে। এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে। দুই ঘণ্টাব্যাপী চলেছিল সংবাদ সম্মেলন। লিখিত বক্তব্য পাঠ করবার পর যথারীতি সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন শেখ মুজিব। তাঁর বক্তব্যের একাংশ বিশেষ মনোযোগ ও বিশ্লেষণ দাবি করে। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন, 'স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বন্ধেও প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমি তাদের পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান চিন্তা করতে অনুরোধ করেছিলাম।'[৩] এই একটি বাক্যে পাকিস্তানের

রাজনীতির সারসত্য তিনি মেলে ধরেছিলেন। একক রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের ভৌগোলিক বাস্তবতা দেশটিকে কার্যত দুই দেশ করে তুলেছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান তো কাগজে-কলমে এক দেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান করাচিতে দাঁড়িয়ে যখন পাকিস্তানের ভূগোলের বাস্তবতা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদর্শন ও পাকিস্তানের ভূগোলের মধ্যকার যে বৈপরীত্য তিনি নির্দেশ করেন সেটাই ক্রমে ইতিহাসের অমোঘ পরিণতির দিকে ধাবিত হয়েছিল এবং সেই পরিবর্তনে কান্ডারির ভূমিকা পালন করেছিলেন মুজিব।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে একুশ-দফা দাবিনামা নিয়ে যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব বিজয়, সরকার গঠন এবং বাঙালি চেতনার সপক্ষে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ পাকিস্তানে এক পরিবর্তনের সম্ভাবনা মেলে ধরেছিল। তবে সেই সম্ভাবনার পথে দেশ এগোতে পারেনি যুক্তফ্রন্টের বহুধা-বিভক্তি এবং শাসকগোষ্ঠীর কূটচালের কারণে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন এই পর্বের ইতি টানে, শুরু হয় চরম পীড়নমূলক একনায়কত্ব।

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন এক কৃষ্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। রাজনৈতিক দলের কাজ, সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান, পত্রপত্রিকায় মুক্তচিন্তার প্রকাশ সব নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, কারাগার ভরে ওঠে রাজবন্দিদের দ্বারা, চরম নিপীড়নমূলক শাসনে সব ধরনের রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ রুদ্ধ করা হয়। সামরিক শাসন জারির পর একের পর এক দুর্নীতির মামলা দায়ের করে শেখ মুজিবকে হয়রানি এবং তাঁর জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব জয়লাভ করেন।

৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ জননিরাপত্তা আইনে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হন মাওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খান আবদুল গাফফার খানসহ আরো অনেক নেতা। একই সময়ে সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠছিল। আন্দোলনের চাপে শেখ মুজিব মুক্তিলাভ করেন ১৯শে জুন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী এরপর মুক্তি পান। প্রতিরোধ সংগ্রামের স্ফুরণ এবং আন্দোলনের শক্তিময়তার পরিচয় গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ রচনায় শেখ মুজিবের আস্থা দৃঢ়মূল করে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলবার সাধনায় তিনি আরো একাগ্র ও দৃঢ়বদ্ধ হন। এদিকে মুক্তির পর চিকিৎসার জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী লন্ডন যান, পরে আগস্টের মধ্যভাগে শেখ মুজিব সেখানে গিয়ে তাঁর নেতার সঙ্গে দেখা করেন। লন্ডন থেকে ফিরে এসে এনডিএফ বা সর্বদলীয় প্ল্যাটফর্মে আন্দোলন পরিচালনার পাশাপাশি রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করেন শেখ মুজিব। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভবিষ্যৎ রাজনীতির বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। এরই প্রকাশ আমরা দেখি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অন্যতম নেতা এবং বিলুপ্ত বা নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ২০শে অক্টোবর ১৯৬৩ তাঁর বাসভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে, যেখানে তিনি বলেন, 'পরিস্থিতির নিদারুণ পরিণতিতে আজ আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছি যে, পূর্ব পাকিস্তান একটি উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে এবং এই ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে আমাদের অবিরাম সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে।'[৪] দুই অংশের মধ্যে হাজার মাইলের ব্যবধান-সম্পন্ন একান্ত ব্যতিক্রমী পাকিস্তান রাষ্ট্রে পশ্চিমাংশ যে-আধিপত্য বিস্তার করেছিল পূর্বাংশের ওপর সেটা যে ঔপনিবেশিক চরিত্র ধারণ করেছে তা শনাক্ত করে আন্দোলনের ডাক দিলেন শেখ মুজিব। পূর্ব বাংলার বাঙালিদের জাতীয় চেতনা নিয়ে জাগরণ ব্যতীত ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলন সফল হতে পারে না। তাই একদিকে শেখ মুজিব ঔপনিবেশিক শোষণের স্বরূপ মেলে ধরার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, অপরদিকে জাতীয় অধিকারের দাবি জোরের সঙ্গে মেলে ধরলেন। তবে রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান ছিল অখণ্ড ও একক, তাই এর একাংশ তথা বৃহদংশ পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনকে সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করার সুযোগ ছিল না, ছিল না স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপনের; যেজন্য শেখ মুজিবকে হতে হয়েছিল কৌশলী। একই সংবাদ সম্মেলনের আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, 'ঔপনিবেশিকতার বেড়াজাল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আন্দোলন শুরু করার প্রশ্নে তিনি বলেন যে, ইহার অর্থ এই নয় যে আমরা পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাই।...আমরা আমাদের ন্যায্য অংশ ন্যায্য বিচার চাই। দেশের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের বাস পূর্ব পাকিস্তানে। সুতরাং জাতীয় সম্পদের শতকরা ৫৬ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানিকে দিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে শতকরা ৫৬ ভাগ অংশ দিতে হইবে।'[৫] পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর যে আন্দোলন চলছিল তার থেকে এই দাবি একেবারে আলাদা। সর্বোপরি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে একাংশের ওপর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ চাপিয়ে দেয়ার বাস্তবতা শেখ মুজিবই দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেছিলেন।

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে দেশে ফেরার পথে বৈরুতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু শেখ মুজিবের কাঁধে স্থাপন করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বভার, তাঁকেই এখন দেখাতে হবে পথ। রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাঙালির মুক্তির সংগ্রামকে অগ্রসর করে নেয়ার সেই পথনির্দেশ তিনি দিলেন ৬-দফা দাবিনামায়, রাজনীতির গভীর উপলব্ধিসম্পন্ন এক ব্যতিক্রমী দলিল। ৬-দফার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব হয়ে উঠলেন ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন নেতা এবং জাতি তাঁকে বরণ করল বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের কান্ডারি হিসেবে। ৬-দফার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অধিকার-চেতনায় গভীর ভাবনা আনয়নকারী দিকসমূহ একত্র করে এর রাজনৈতিক রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন। পাকিস্তানের ভূগোল যে নির্ধারণ করে দিচ্ছে পাকিস্তানের রাজনীতি সেই উপলব্ধি তিনি সূচনাকালেই দেখিয়েছিলেন। এবার সেই উপলব্ধিকে আন্দোলনের কর্মসূচিতে পরিণত করলেন তিনি ৬-দফার মাধ্যমে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে সংহত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি কার্যত পূর্বাঞ্চলের ওপর পশ্চিমের ঔপনিবেশিক

শাসনের রূপ ধারণ করেছিল। সেই বাস্তব চিত্র মেলে ধরতে দেশব্যাপী প্রচার-প্রচারণার বিপুল উদ্যোগ গ্রহণ করেন শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় ৬-দফার কোথাও বাঙালির জাতীয় অধিকার কিংবা বাঙালিত্বের আদর্শগত অবস্থান সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই, কিন্তু এর প্রতিটি দাবিতে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বশাসনের উপায় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেয়া হয়েছে বাস্তবায়নের খুঁটিনাটি পন্থা চিহ্নিত করে।

শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা তুলে ধরেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বাঁচার দাবি হিসেবে, সর্বপাকিস্তান রাজনীতি বা কর্মসূচি নিয়ে তিনি ভাবিত হননি। যদি আমরা বিবেচনায় নিই ৬-দফার চিন্তাগত ভিত্তি, তাহলে দেখা যাবে এখানে প্রতিফলিত হয়েছে Right of the Nations for Self-determination বা জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতি। সেই ভিত্তিতে ফেডারেল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পূর্বাংশ নিজস্বভাবে রাষ্ট্রের কোন কোন কর্মকাণ্ড কীভাবে পরিচালনা করবে তা ৬-দফায় বিবৃত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এখানে গুরুত্ব পেয়েছে অর্থনীতি, প্রশাসন, প্রতিরক্ষানীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য ও সহায়তা ইত্যাদি। কিন্তু এর মূল সুর ছিল বাঙালির জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা। সর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগ নয়, ৬-দফা শেখ মুজিব প্রচার করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষে এবং ব্যতিক্রমীভাবে এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাঁর নিজের পক্ষে।

সংক্ষিপ্ত, তির্যক, বারুদ ও স্বপ্নঠাসা ৬-দফা দাবিনামা ঘোষণা করা হয় ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এবং তা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতো বাঙালির অন্তরে সাড়া জাগায়, জাতীয় অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রামে ঝাঁপ দেয় জাতি। ৭ই জুন দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন বুঝিয়ে দেয় এর তীব্রতা ও গভীরতা। গ্রেপ্তার হলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও নেতৃবৃন্দ। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাঙালির জাতিসত্তা ও জাতীয় অধিকারের প্রবক্তা শেখ মুজিবকে কারাগারে আটক করেই ক্ষান্ত হয় না সরকার। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাঁকে নেয়া হয় ক্যান্টনমেন্টের বন্দিশালায়, দায়ের করা হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা, যা পরিচিতি পায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে।

গণ-আন্দোলনের প্রতাপে সব ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করে শেখ মুজিবুর রহমান ক্যান্টনমেন্টের কারাগার থেকে মুক্ত মানুষ হিসেবে বের হয়ে আসেন ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে, বাতিল হয় আগরতলা মামলা, শেখ মুজিব বরিত হলেন 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে, লৌহমানব আইয়ুব খান বিদায় নেন মুষিকের মতো। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির প্রধান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো পালটে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার পথরেখা নির্মাণে তাঁর ভূমিকা হয়ে ওঠে মুখ্য। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বঙ্গবন্ধু এ-যাত্রা দুই মূল প্রশ্নে ছিলেন আপসহীন। 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতির প্রশ্নে কোনো ছাড় না দিতে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে স্বীকৃত হয়েছিল 'এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি', যার ফলে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬৭টি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অংশে। দ্বিতীয়ত বঙ্গবন্ধু কোনো ধরনের রাজনৈতিক ঐক্য অথবা ফ্রন্ট গঠনের প্রয়াস পরিত্যাজ্য করে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৬-দফার পক্ষে জনগণের ম্যান্ডেট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। নির্বাচন বঙ্গবন্ধুর অবস্থানের পক্ষে অভূতপূর্ব গণরায় প্রদত্ত হয়, ৬-দফার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে ওঠে, তবে দ্বিধা-সংশয় ছিল অনেক। বাঙালির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে নির্বাচনী ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর অর্পিত হলো অনন্য দায়িত্ব, গণতান্ত্রিক পন্থায় জাতীয় মুক্তি অর্জন।

গোটা জাতি স্বাধীনতার জন্য যখন উদ্বেল হয়ে উঠেছে তখন ৭ই মার্চ যে ভাষণ প্রদান করলেন বঙ্গবন্ধু, তার ব্যাখ্যা স্বল্প-পরিসরে করা সম্ভব নয়। ভাষণে বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নিরিখে পাকিস্তানের বঞ্চনা ও শোষণের চিত্র মেলে ধরেন বঙ্গবন্ধু। জনগণের নির্বাচনী রায় মান্য করে অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি তিনি জানান। আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের দুয়ার খোলা রেখে তিনি ডাক দেন সার্বিক প্রতিরোধের, আর যদি একটা গুলি চলে তবে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে করা হবে মোকাবিলা, প্রত্যেক ঘর হয়ে উঠবে দুর্গ, নিরস্ত্র বাঙালি পরিণত হবে সশস্ত্র যোদ্ধায়, জাতীয় মুক্তির গণতান্ত্রিক সংগ্রাম রূপান্তরিত হবে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে। ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেননি, আবার ডাক দিলেনও বটে, শত্রুকে আঘাত হানবার কোনো সুযোগ তিনি করে দেননি, অন্যদিকে যে-কোনো আক্রমণ প্রতিরোধে প্রস্তুত করলেন জাতিকে, জনতার শক্তিতে জাতির মুক্তির লড়াইয়ের রণদামামা বেজে উঠেছিল এই ভাষণে। Unilateral Declaration of Independence দেননি বঙ্গবন্ধু, সেটা হলে বাংলাদেশ আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদ হিসেবে চিহ্নিত করে রক্তবন্যায় ডুবিয়ে দেয়া যেত রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার নামে। অন্যদিকে Rights of the People for Self-determination-এর পরাকাষ্ঠা দেখালেন শেখ মুজিব যখন তিনি ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

এখন দুটি তাৎপর্যময় দলিল থেকে ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতির সহায়তা আমরা গ্রহণ করব। প্রথম দলিলটি ইংরেজিতে প্রণীত, ৭ই মার্চ সন্ধ্যায় সমবেত বিদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর এই বিবৃতি বিলি করা হয়, রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ তিনি প্রদান করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এখানে রয়েছে, তবে কিছু সংযোজন-বিয়োজনও আছে। দলিলের শিরোনাম, Press Statement issued by Sheikh Mujibur Rahman at Dacca on Sunday, 7th March, 1971। এই বিবৃতিতে নির্বাচনী রায়ের উল্লেখ করে লেখা হয়েছে, 'We as the representatives of the overwhelmingly majority of the people of Bangla Desh assert that we are the only legitimate source of authority for Bangla Desh. Indeed by virtue of our majority position we are the legitimate source of authority for the whole country.'

কলোনির বাস্তবতাও এখানে উল্লিখিত হয়েছে এবং প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হওয়ার। সংবাদ-

বিবৃতির শেষে বলা হয়েছে, 'The people have already proclaimed to the world that they shall no longer allow themselves to be exploited as a colony or a market. They have expressed their determination to be the free citizens of a free country.'[৬]

বাংলাদেশ সংগ্রাম কি বিচ্ছিন্নতাবাদী অথবা এই আন্দোলনের রয়েছে উপনিবেশবাদ-বিরোধী তাৎপর্য, পদানত জাতির মুক্তির অধিকারের স্বীকৃতির সঙ্গে তা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ– এমন বিতর্ক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রবল হয়ে উঠেছিল। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ১৯৬০ সালের ঔপনিবেশিক দেশের স্বাধীনতার অধিকারের ঘোষণা এবং ১৯৭০ সালের জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির প্রতি সমর্থন রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আমরা এখন পাঠ নিতে পারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের মূল্যায়ন। ১৩ই মার্চ ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের কাছে দু'পাতার নোট পাঠিয়ে ৭ই মার্চ প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্পর্কে নিজ বিশ্লেষণ প্রেসিডেন্টকে জ্ঞাত করান হেনরি কিসিঞ্জার। এই বিশ্লেষণ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য, এখানে কিসিঞ্জার নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে তাঁর বিশ্লেষণ প্রদান করে ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে সে-সম্পর্কে ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন, নিজের মত বিশেষ দেননি। এই রীতি ও নীতি অবশ্য তিনি পরে আর বজায় রাখতে পারেননি, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। যা-ই হোক, ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে সেই নোটে হেনরি কিসিঞ্জার লিখেছিলেন :

While East Pakistani leader Mujibur Rahman has stepped back a bit from a declaration of independence, the full text of his March 7 speech conveys a harsher tone than the initial summary reports, and it seems apparent that his retreat was tactical. He made clear that something very close to independence, i.e., "emancipation," is his goal and that his movement will not be deflected until that is achieved. Noteworthy also is the fact that Rahman quite openly took issue with Yahya, accusing him of "submitting to the declaration of a minority" [West Pakistan] and asserting that his own Awami League is the only legitimate source of authority in the country.

Our embassy in Islamabad believes that Rahman's goal remains unchanged "emancipation" of East Pakistan from West Pakistani domination. This could still conceivably mean "full provincial autonomy" within a united Pakistan. But it is just as likely, if not more so, that Rahman has come to believe firmly that the freedom he seeks is only attainable by outright independence. His speech last Sunday would suggest an effort to achieve his goal by gradual assertion of power without risking a direct confrontation with the army that might follow a unilateral declaration of independence.

বঙ্গবন্ধু 'মুক্তি' ও 'স্বাধীনতা' শব্দদ্বয় ব্যবহার করে স্বাধীনতার স্বপ্ন সবার অন্তরে গেঁথে দিয়েছিলেন, আবার এককভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার হঠকারিতাও তিনি করেননি। সেটা কিসিঞ্জার ভালোই বুঝেছিলেন। দু-পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিশ্লেষণের উপসংহারে হেনরি কিসিঞ্জার স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেন, ইয়াহিয়া খান বাঙালিদের দমিয়ে রাখতে পারবে না। শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলন প্রেসিডেন্টকে চরমপন্থা নেয়ার সুযোগবঞ্চিত করেছে এটাও কিসিঞ্জার বুঝেছিলেন।[৭]

হেনরি কিসিঞ্জার বুঝতে পেরেছিলেন, পাকিস্তান বাহিনী বাংলাদেশকে কাবু করতে পারবে না, তবু তিনি রক্তপাত বন্ধে কোনো পদক্ষেপ নেননি, বরং সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন পাকিস্তানের পরাজয় ঠেকাতে। গণহত্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ মুক্তির লড়াই সূচিত হলো ২৬শে মার্চ, এর পক্ষকালের মধ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা গঠন করে সরকার এবং ১৭ই মার্চ কুষ্টিয়ার মুক্তাঞ্চলে নব-গঠিত বাংলাদেশ সরকারের সদস্যরা শপথ গ্রহণ করে, পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং মুক্তবাংলায় কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথতলায় পঠিত স্বাধীনতার ঘোষণা মিলিয়ে বিবেচনা করলে আমরা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের শাসনতান্ত্রিক পরম্পরা ও ভিত্তি অনুধাবন করতে পারি। ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং স্বশাসনের পক্ষে বাঙালি জাতির অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধ গণরায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের আইনগত ভিত্তি প্রদান করে এবং জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্য তৈরি করে। ■

তথ্যসূত্র

১. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫
২. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২
৩. অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪
৪. সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু, দ্বিতীয় খণ্ড : প্রথম পর্ব, সম্পাদনা– মো. শাহ আলমগীর, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০১৫, পৃ. ২৪১ (দৈনিক ইত্তেফাক থেকে উদ্ধৃত)।
৫. সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫
৬. Press Statement issued by Sheikh Mujibur Rahman on 7 March, 1971. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত দলিল
৭. NSC Files, Box 625, vol. IV, Kissinger to Nixon, 13 March, 1971.

বিডিআর বিদ্রোহের মামলায় হাইকোর্টের রায় ঘোষণা

মাবরুক মোহাম্মদ

২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহের নামে পিলখানায় বিডিআর সদর দপ্তরে ঘটেছিল এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড। এ ঘটনায় ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন প্রাণ হারান। বিচারের মুখোমুখি করা হয় ৮৪৬ বিডিআর জওয়ানকে। মামলার চার আসামি বিচার চলাকালে মারা যান। আসামির সংখ্যার দিক থেকে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হত্যা মামলা।

পিলখানায় ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে হত্যার দায়ে ১৩৯ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট। এ ছাড়া যাবজ্জীবন দেয়া হয়েছে ১৮৫ জনকে। আর ২০০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে এবং খালাস পেয়েছেন ৪৫ জন। বিচারিক আদালত ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর এ মামলায় ১৫২ জনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুর আদেশ দেন। এঁদের একজন ছাড়া সবাই তৎকালীন বিডিআরের সদস্য। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয় ১৬১ জনকে। সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজা পান আরো ২৫৬ জন। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস পান ২৭৮ জন আসামি। সাজা হয় মোট ৫৬৮ জনের। বিচারিক আদালতের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকায় এক নম্বরে ছিলেন বিদ্রোহের অন্যতম পরিকল্পনাকারী উপসহকারী পরিচালক (ডিএডি) তৌহিদুল আলম। বিডিআরের বাইরে দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এঁরা হলেন বিএনপির সাবেক সাংসদ নাসির উদ্দিন আহম্মেদ পিন্টু ও স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা তোরাব আলী। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে কারাগারে মারা যান নাসির উদ্দিন আহম্মেদ পিন্টু। নিম্ন আদালতের রায়টি ছিল মোট ৪ হাজার পৃষ্ঠার। সাজার রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডিত ব্যক্তিরাও জেল আপিল ও আপিল করেন। ৬৯ জনকে খালাসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করে। এসবের ওপর ২০১৫ সালের ১৮ জানুয়ারি হাইকোর্টে শুনানি শুরু হয়, শেষ হয় ৩৭০তম দিনে গত ১৩ এপ্রিল ২০১৭।

বিডিআর বিদ্রোহ : ফিরে দেখা

২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ছিল বিডিআরের বার্ষিক দরবারের দিন। অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ৯টায় সদর দপ্তরের দরবার হলে। সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ, উপমহাপরিচালক (ডিডিজি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম এ বারী, বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তাসহ বিডিআরের নানা পদের সদস্যরা। সরকারি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে, ওই দিন দরবারে উপস্থিত ছিলেন ২ হাজার ৫৬০ জন।

দরবার শুরুর পর ডিজির বক্তব্য চলাকালে সকাল ৯টা ২৬ মিনিটে মঞ্চের বাঁ দিকের পেছন থেকে দুজন বিদ্রোহী জওয়ান অতর্কিতে মঞ্চে প্রবেশ করেন, একজন ছিলেন সশস্ত্র। শুরু হয় বিদ্রোহ। দরবার হলের বাইরে থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যে লাল-সবুজ রঙের কাপড় দিয়ে নাক-মুখ বাঁধা বিদ্রোহী জওয়ানেরা দরবার হল ঘিরে গুলি শুরু করেন।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিদ্রোহীরা কর্মকর্তাদের দরবার হল থেকে সারিবদ্ধভাবে বের করে আনেন। ডিজির নেতৃত্বে কর্মকর্তারা দরবার হলের বাইরে পা রাখামাত্র মুখে কাপড় ও মাথায় হলুদ রঙের হেলমেট পরা চারজন ডিজিকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করেন। ডিজির পর হত্যা করা হয় আরো কয়েকজন কর্মকর্তাকে।

এরপর পিলখানার ভেতরে ধ্বংসযজ্ঞ চলতে থাকে। দুপুর সোয়া ১২টার দিকে বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে করে বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান জানিয়ে লিফলেট ছাড়া হলে ওই হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন বিদ্রোহীরা। এ সময় প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে বিদ্রোহীরা এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়েন। তাঁরা মাইকে জানান, আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পিলখানায় আসতে হবে।

পিলখানার এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে দেশের আরো কয়েকটি জায়গায়, যেখানে জওয়ানরা অস্ত্র গোলাবারুদ নিজেদের জিম্মায় নিয়ে বিদ্রোহে সমর্থন জানায়।

ঘটনার দিন আলোচনার মাধ্যমে বিদ্রোহীদের নিরস্ত্রীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বেলা দেড়টার দিকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সাদা পতাকা নিয়ে পিলখানার ৪ নম্বর ফটকের সামনে যান তৎকালীন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক ও জাতীয় সংসদের হুইপ মির্জা আজম। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ১৪ সদস্যের বিডিআর প্রতিনিধিদলকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। সন্ধ্যা ৬টার দিকে জনাব নানক সাংবাদিকদের জানান, প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন এবং অস্ত্র জমা দিয়ে ব্যারাকে ফেরার নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু সন্ধ্যা ৭টার দিকে প্রধানমন্ত্রীর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাকে প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশের দাবি করেন বিদ্রোহী জওয়ানেরা। তাঁরা আগের মতো উচ্ছৃঙ্খল আচরণ শুরু করেন। সন্ধ্যায় পিলখানার বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নিহত সেনা কর্মকর্তাদের লাশ মাটিতে পুঁতে ও সরিয়ে ফেলা হয়। লুটপাট ও ধর্ষণও চালানো হয় পিলখানার ভেতরে।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ বেলা আড়াইটায় টেলিভিশন ও বেতারে প্রচারিত জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পণ করে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। এরপর বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমর্পণ শুরু করেন।

বিচারিক প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক

বিদ্রোহের সময় সেনা কর্মকর্তাদের নৃশংসভাবে হত্যা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সারা দেশে নিন্দার ঝড় ওঠে। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা ডেপুটেশনে বিডিআরে কাজ করেন বলে সেনা আইনে বিডিআর বিদ্রোহের বিচারের দাবি তোলা হয়। এ ছাড়াও বিডিআর আইনে বিদ্রোহের শাস্তি সাত বছরের কারাদণ্ড, আর সেনা আইনে বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সেনা কর্মকর্তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যার কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা বলে কয়েকটি মহল থেকে এই দাবি তোলা হয়। কিছু মহল থেকে আবার সেনা আইনে বিচারের বিরোধিতা আসে। এ ক্ষেত্রে সেনা আইনে বিচারের কিছু আইনগত সমস্যা তুলে ধরা হয়। আর্মি অ্যাক্ট, ১৯৫২-এর ৫(১) ধারা অনুযায়ী সরকার প্রয়োজনবোধে এই আইনকে অন্য শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু বিডিআর বিদ্রোহের সময় এই আইন বিডিআরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। তাই সেনা আইনকে প্রয়োগের জন্য ভূতাপেক্ষা কার্যকারিতা (retrospective effect) দিতে হতো। এ ছাড়াও বিডিআর বাহিনী নিজস্ব আইনে পরিচালিত হতো। তাই কেবল বিডিআর বিদ্রোহের বিচার সেনা আইনে করা সম্ভব ছিল না। আর সেনা আইন বিদ্রোহের বিচারের জন্য প্রয়োগ করা হলে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি পেত। সংবিধানের ৩৫(১) অনুযায়ী অপরাধের শাস্তি বৃদ্ধির জন্য কোনো আইনকে ভূতাপেক্ষা কার্যকারিতা দেয়া যায় না। বিতর্ক চরমে পৌঁছলে রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সুপ্রিম কোর্টে রেফারেন্স প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে সহযোগিতার জন্য কোর্ট ১০ জন খ্যাতনামা আইনজীবীকে অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে নিয়োগ দেন। ১০ জনের মধ্যে দুজন সেনা আইনে বিচারের পক্ষে, সাতজন বিডিআর আইনে বিচারের পক্ষে এবং একজন রেফারেন্স ফেরত পাঠানোর পক্ষে মত দেন। সবার বক্তব্য শেষে আদালত বিডিআর বিদ্রোহের বিচার সেনা আইনে করা সম্ভব নয় বলে মতামত দেন। বিদ্রোহের বিচার হবে বিডিআর আইনে এবং অন্যান্য অপরাধের বিচার হবে দেশে প্রচলিত সাধারণ আইনে। এ লক্ষ্যে সারা দেশকে ছয়টি ভাগে ভাগ করে বিডিআর আইন অনুসারে মোট ছয়টি বিশেষ আদালত গঠন করে বিদ্রোহের বিচার পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। মামলার তদন্ত ও বিচারকালে কমপক্ষে ৫০ জন বিডিআর সদস্য হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেন।

হাইকোর্টের রায়

বিচারপতি মো. শওকত হোসেনের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ এই রায় দেন। বেঞ্চের অপর দুই বিচারপতি হলেন মো. আবু জাফর সিদ্দিকী ও মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে রায়ে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে এবং এই বিদ্রোহের ঘটনার ব্যাপারে আদালত নিজস্ব পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন। হাইকোর্টের রায় পড়তে দুই দিন সময় লাগে। বিষয়টিকে অনেক আইনজীবীই নজিরবিহীন বলেছেন। এ মামলায় আদালত ১ হাজার পৃষ্ঠার বেশি পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন। সম্পূর্ণ রায় প্রায় ১০ হাজার পৃষ্ঠার। হাইকোর্টের রায়ের মধ্য দিয়ে মামলাটির বিচারপ্রক্রিয়ার দুটি ধাপ শেষ হলো।

বিচারপতি মো. শওকত হোসেনের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিশেষ বেঞ্চ রায়ের পাঁচ দফা পর্যবেক্ষণে বলেছেন– ১. বিডিআরের বিদ্রোহীরা পরস্পরের যোগসাজশে এবং অভিন্ন লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করেছে, যার উদ্দেশ্য ছিল বিডিআরকে (বর্তমান বিজিবি) সেনা কর্মকর্তামুক্ত করা এবং বাহিনীতে নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ২. কোনো উসকানি, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, হতাশা বা ক্ষোভই পিলখানার ৫৭ জন চৌকস ও সম্ভাবনাময় সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে হত্যার ন্যায্যতা দিতে পারে না। ৩. অপরাধের ইতিহাসে এটি নজিরবিহীন ঘটনা। এই হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে জাতি কিছু প্রতিশ্রুতিশীল, উজ্জ্বল, সম্মানিত ও প্রতিভাবান সেনা কর্মকর্তাকে হারিয়েছে। এই ক্ষতি পূরণ হতে দীর্ঘ সময় লাগবে। বিডিআরের অবাধ্য বিদ্রোহীরা যে মাত্রায়

নৃশংসতা দেখিয়েছে, তা কোনো সভ্য সমাজ মেনে নেবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার মাত্রা ছাড়িয়েছে। ৪. ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে এটাই বেরিয়ে আসে যে, অভ্যন্তরীণ কিংবা বাইরের শক্তি নবগঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারকে উৎখাত করতেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। ৫. এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য কোনো মহলের নীলনকশায় দেশে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করা এবং গণতন্ত্রের ধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। আদালত বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় তৎকালীন ইপিআর পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত এই বাহিনী দেশে-বিদেশে সম্মানের সঙ্গে কাজ করেছে। কিন্তু ২০০৯ সালে পিলখানায় তৎকালীন বিডিআরের কিছু সদস্য আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। এই কলঙ্কচিহ্ন তাঁদের অনেক দিন বয়ে বেড়াতে হবে। রায়ে বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার বলেন, তৎকালীন বিডিআরের নিজস্ব গোয়েন্দারা কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তা আগে জানতে পারেনি, সেই ব্যর্থতা খুঁজতে একটি তদন্ত কমিটি করা দরকার। তিনি মহাপরিচালকের উদ্দেশে বলেন, কোনো সমস্যা এলে তা তাৎক্ষণিক সমাধান করতে হবে। বিজিবির জওয়ানরা কোনো সমস্যা নিয়ে এলে তা মীমাংসা করতে হবে এবং বিজিবিতে সেনা কর্মকর্তা ও জওয়ানদের মধ্যে পেশাদারি সম্পর্ক থাকতে হবে। বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার প্রশ্ন করেন, কেন সে সময়ের বিডিআর ডাল-ভাত কর্মসূচি নিল। ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো কর্মসূচি যেন না নেয়া হয়, সে ব্যাপারে বিজিবিকে সতর্ক করেন তিনি।

আরেক বিচারপতি মো. শওকত হোসেন বলেন, কোনো সেনা কর্মকর্তা সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে থাকবে না, এটাই ছিল বিদ্রোহে অংশ নেয়া ব্যক্তিদের মূল মনোভাব। তিনি জওয়ানদের সঙ্গে ঔপনিবেশিক (কলোনিয়াল) আমলের মতো ব্যবহার না করার কথা বলেন। তিনি বলেন, একই দেশ। এখানে সবাই ভাই ভাই।

পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আদালত সাত দফা সুপারিশ তুলে ধরেছেন : ১. এটা আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা (পায়াস উইশ), অপারেশন ডাল-ভাতের মতো এমন কোনো কার্যক্রম নেওয়া উচিত নয়, যা বিজিবির সদস্যদের গৌরব ও আত্মসম্মানে আঘাত হানে। এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, এ ধরনের কর্মসূচি তাদের সৈনিকমূলক আচরণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ২. অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যকার পেশাদারি সম্পর্ক বিজিবির আইন মোতাবেক হতে হবে। ৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিজিবি কর্তৃপক্ষকে বিজিবি সদস্যদের যে-কোনো সমস্যা বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত সমাধান দিতে হবে। ৪. বিজিবির সদস্য ও কর্মকর্তাদের মধ্যে এখনো কোনো দুঃখ-দুর্দশা থাকলে বিজিবি কর্তৃপক্ষকে তা মিটিয়ে ফেলতে হবে। ৫. বিজিবির কোনো সদস্যের ভ্রমণ ভাতা ও দৈনন্দিন ভাতা এখনো বাকি থাকলে তা দ্রুত মিটিয়ে দিতে হবে। ৬. বিজিবিকর্তৃপক্ষকে তাদের অর্জিত ছুটি এবং এই সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধান করতে হবে। ৭. বিডিআরের রাইফেল সিকিউরিটি ইউনিট কেন বিডিআর হত্যাযজ্ঞের আগে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন এবং প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য বিজিবি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছেন আদালত।

রায়ের প্রয়োগ

এই মামলার রায় কার্যকর করার জন্য এখনো কিছু আইনি ধাপ বাকি আছে। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে। আর সর্বশেষ ধাপে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করতে পারবেন। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া শেষে কতজন চূড়ান্তভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবেন সেটি এখনই বলা যাচ্ছে না। মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডকে নিরুৎসাহিত করা হয়। রায় কার্যকরের পরে এই বিদ্রোহের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তরা সান্ত্বনা নিতে পারেন যে, তাঁরা একটি বিচার পেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তাদের স্বজনদের ফিরে পাবেন না। আবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের পরিবার তাদের স্বজনদের কৃতকর্মের ভুক্তভোগী হবে। এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ভবিষ্যতে এড়ানোর জন্য সরকার সামরিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি করে বাহিনীগুলোর গঠন ও এই ধরনের ঘটনা মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক কর্মকৌশল নির্ধারণের বিষয়ে ভেবে দেখতে পারে। ■

তথ্যসূত্র

১. দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর ২০১৭
২. আসক বুলেটিন মার্চ ২০১১

চলন্ত বাসে নারীর প্রতি সহিংসতার ভয়াবহতম রূপ

রূপা ধর্ষণ ও হত্যা মামলা

লতিফ মাহমুদ

২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতের দক্ষিণ দিল্লিতে চলন্ত বাসে গণধর্ষণ ও ভয়াবহ নির্যাতনের ফলে জ্যোতি সিং নামের এক ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনা শুধু ভারত জুড়েই নয়, সারা বিশ্বেই ভীষণ রকম আলোড়ন তুলেছিল। ভারতীয় আইনে ধর্ষণের শিকার নারীর নাম প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই নাম প্রকাশের আগ পর্যন্ত জ্যোতি সিং নির্ভয়া বা ভয়হীন নামেই পরিচিত হয়েছিল এবং জ্যোতি সিং নামের সেই নির্ভয়া ধর্ষণের অবসান ঘটানো এবং ধর্ষণকে অস্বীকার করা অথবা অপরাধ সংঘটনকারীর পরিবর্তে ধর্ষণের শিকার নারীকেই দোষারূপ করার সংস্কৃতির অবসানের লক্ষ্যে ভারতের নারীদের সংগ্রামের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু শুধু ভারতেই নয়, বাংলাদেশেও নারীরা গণপরিবহণে নিরাপদ নয়। চলন্ত বাসে ধর্ষণের ঘটনা বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময়

জাকিয়া সুলতানা রূপা

ঘটেছে। ২০১৩ সালের ২৪ জানুয়ারি দিনের বেলায় নবীনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলায় যাওয়ার পথে শুভযাত্রা পরিবহণের একটি বাসে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন একজন পোশাক শ্রমিক। গত ২৭ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে চট্টগ্রামে চালক ও চালকের সহকারী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হন এক নারী পোশাকশ্রমিক। তবে তুলনামূলকভাবে বেশি আলোচিত হয়েছে ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে গণধর্ষণ ও হত্যার শিকার হওয়া জাকিয়া সুলতানা রূপার ঘটনাটি।

গত ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখে বগুড়া থেকে ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে বাসশ্রমিকেরা রূপাকে ধর্ষণ ও হত্যা করে টাঙ্গাইলের মধুপুর বন এলাকায় ফেলে রেখে যায়। সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার মেয়ে রূপা বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করে ঢাকা আইডিয়াল ল' কলেজে পড়াশোনা করছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন তিনি। ঘটনার দিন রূপা শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা শেষে বগুড়া থেকে ময়মনসিংহ যাওয়ার জন্য সন্ধ্যা ৭টার দিকে ছোঁয়া পরিবহণের একটি বাসে উঠেছিলেন। সংবাদমাধ্যমের সূত্রে জানা যায় যে, বাসটি টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার কাছাকাছি এলে বাসের সহকারী শামীম জোর করে রূপাকে বাসের পেছনের আসনে নিয়ে যায়। এ সময় রূপা তাঁর কাছে থাকা ৫ হাজার টাকা ও মুঠোফোন শামীমকে দিয়ে ক্ষতি না করার অনুরোধ জানালেও সেই অনুরোধ উপেক্ষা করে শামীম, আকরাম ও জাহাঙ্গীর তাঁকে ধর্ষণ করে। রূপা চিৎকার শুরু করলে ধর্ষকেরা তাঁর মুখ চেপে ধরে এবং একপর্যায়ে ঘাড় মটকে রূপাকে হত্যা করে মধুপুরের পঁচিশ মাইল এলাকার রাস্তার পাশে লাশটি ফেলে দেয়।

এই ঘটনায় অভিযুক্ত বাসের চালক হাবিব, সুপারভাইজার সফেদ আলি, বাসের সহকারী শামীম, আকরাম ও জাহাঙ্গীরকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত এই পাঁচজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, হত্যা, লাশ গুম ও সহায়তার অভিযোগে গত ১৫ অক্টোবর আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। ২৫ অক্টোবর শুনানি শেষে আদালত অভিযোগপত্র গ্রহণ করেন এবং ১৩ অক্টোবর অভিযোগ গঠনের দিন ধার্য করেন। কিন্তু একবার বিচারক অসুস্থ থাকায় এবং পরের বার অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী অসুস্থ থাকায় তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগ গঠন কার্যক্রম দুবার পিছাল। অভিযোগ গঠনের পরবর্তী দিন ধার্য করা হয়েছে ২৯ নভেম্বর ২০১৭।

দ্বিতীয়বারের মতো অভিযোগ গঠনের দিন পিছানোর আগ পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার, পুলিশি তদন্ত ও অভিযোগপত্র দাখিল, আদালত কর্তৃক অভিযোগপত্র গ্রহণ দ্রুত সম্পন্ন হওয়ায় রূপা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার বিচারিক অগ্রগতি সবাইকে আশ্বস্ত করেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে মামলাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রূপার স্বজনদের পক্ষ থেকে মামলাটিকে নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল থেকে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর ও দ্রুত হত্যাকারীদের বিচার ও শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। রূপার পরিবার ও স্বজনদের মতো আমরাও এই ধর্ষণ ও হত্যা মামলার সুষ্ঠু বিচার আশা করছি।

প্রতিবছরের মতো এবারও ২৫ নভেম্বর বিশ্ব জুড়ে পালিত হচ্ছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত পালিত হবে নারী নির্যাতনবিরোধী পক্ষ। নারীর প্রতি সংঘটিত সব ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হবে। কিন্তু শুধু দিবসকেন্দ্রিক প্রতিবাদে আদৌ কোনো সফলতা আসছে কি? রূপা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার অভিযোগ গঠনের তারিখ পিছানোর খবরটি দৈনিক সমকাল-এর যে কলামে ছেপেছে, তার পরের কলামেরই খবরটি হচ্ছে মৌলভীবাজারে এনজিও কর্মী গণধর্ষণের শিকার এবং নাটোরে প্রতিবন্ধী নারীকে ধর্ষণসংক্রান্ত। ঠিক তারপরের কলামেরই আরেকটি খবরের শিরোনাম হলো প্রথম স্ত্রীর পর দ্বিতীয় স্ত্রীকেও হত্যা। কাকতালীয় হতে পারে! কিন্তু পত্রিকার পাতা খুললেই এ রকম অনেক সংবাদ চোখে পড়ে। যদিও আমরা জানি, নারী নির্যাতনের প্রায় অর্ধেকের বেশি ঘটনা অপ্রকাশিতই থেকে যায়।

শেষ কথা হচ্ছে, নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করে নারীর জন্য নিরাপদ ও ভয়মুক্ত চলাফেরার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে নারীনির্যাতন-বিরোধী আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি হচ্ছে ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে নারীর স্বাধীন সত্তা ও চলাফেরার স্বাধীনতাকে সম্মান দেখানোর শিক্ষা ও তাঁর চর্চা। প্রয়োজন নারীর প্রতি সহিংসতা সংঘটনকারী ব্যক্তিদের পরিবার ও সামাজিকভাবে বয়কট করা। ■

নবজাতকের মৃত্যু ও উচ্চতর আদালতের সুয়োমুটো রুল

সেগুফ্‌তা তাবাস্‌সুম আহমেদ

মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্যতম একটি হলো চিকিৎসা লাভের অধিকার। জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২৫(ক) ধারামতে, প্রত্যেকের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্তে খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবাসহ পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের উন্নতিসাধনের জন্য জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ– অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রতিটি মানুষের জন্য নিশ্চিত করা।

মা ও শিশুমৃত্যু রোধে এবং তাদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার বিষয়ে সবাইকে সচেতন করার প্রত্যয়ে, সবাইকে সচেতন করার পাশাপাশি এসব সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সাল থেকে শুরু হয়েছিল নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে সরকার ২৮ মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসে 'নিরাপদ প্রসব চাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাই' প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে দিবসটি চালনের উদ্যোগ নিয়েছে। অর্থাৎ চিকিৎসা লাভের অধিকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনে মানুষের অপরিহার্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।

গত ১৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে রাতে পারভীন আক্তার (যিনি গোলাপশাহ মাজার এলাকায় একাই বসবাস করতেন) প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান সন্তান প্রসবের জন্য। কিন্তু চিকিৎসকেরা ঢাকা মেডিক্যালের প্রসূতি বিভাগে প্রায় ৪০ জনের মতো জরুরি রোগী (প্রসূতি) অপেক্ষায় থাকার কথা জানিয়ে সেখান থেকে তাঁকে মিটফোর্ড (স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ) হাসপাতালে পাঠান। কিন্তু স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও তাঁকে ভর্তি না করে আজিমপুর মাতৃসদনে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। এরপর ১৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার সকালে পারভীন আজিমপুর মাতৃসদনে ভর্তির চেষ্টা করলেও কর্তৃপক্ষ তাঁর (পারভীন) নামে কোনো রেজিস্ট্রেশন না থাকায় ভর্তি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন পারভীনের খারাপ অবস্থা দেখে এক নারী চিকিৎসক তাঁকে সেখানকার দোতলায় লেবার রুমে নিয়ে যান। ওই চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে বেরিয়ে যেতে না যেতেই এক আয়া লেবার রুমে গিয়ে পারভীনকে জোরপূর্বক বের করে আনে। পারভীনের কাছে একজন আয়া টাকা চাইলে উত্তরে তাঁর কাছে কোনো টাকা নেই জানালে আয়াটি পারভীনকে টেনেহিঁচড়ে নিচে

নামিয়ে মাতৃসদন থেকে বের করে দেয়। সে সময় তাৎক্ষণিকভাবে প্রসবব্যথা হওয়ার কারণে রাস্তার ওপরেই পারভীনের সন্তান প্রসব হয়ে যায়। প্রসবকালীন নবজাতক জীবিত থাকলেও অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নবজাতকের মৃত্যু হয়।

আসক তথ্যানুসন্ধানকারী দলকে পারভীন বলেন, 'আমি গরিব বলে আমার বাবু পৃথিবীর আলো দেখতে পারেনি। কিন্তু যাদের জন্য আমার এই অবস্থা– তার বিচার চাই আমি।'

উচ্চতর আদালতের সুয়োমুটো রুল

গত ১৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে বিচারপতি কাজী রেজাউল হক এবং বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহ সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুলসহ আদেশ প্রদান করেন। আদেশে বলা হয়, স্বাস্থ্যসেবায় দেশের গরিব জনগোষ্ঠী অত্যন্ত নিগৃহীত এবং সরকারি হাসপাতালসমূহে চিকিৎসায় অবহেলার ঘটনায় দৃষ্টান্ত স্থাপন হওয়ার আবশ্যকতা মনে করে অত্র আদালত (১) সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা; (২) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা; (৩) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা; (৪) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা; (৫) পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ; (৬) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা; (৭) মহাপরিচালক, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, ঢাকা; (৮) পরিচালক, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা; (৯) পরিচালক, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা; (১০) তত্ত্বাবধায়ক, মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আজিমপুর, ঢাকা-এর ওপর রুলনিশি জারি করেছেন যে, কী কারণে ওই হাসপাতালসমূহ পারভীন আক্তারকে হাসপাতালে যাওয়ার পরও তাঁর প্রাপ্য চিকিৎসা প্রদানে ব্যর্থ হয় এবং দায়ী ও দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এবং কেন তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না। আদালত আদেশে আরো বলেন যে, পরিচালক, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা; পরিচালক, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা এবং তত্ত্বাবধায়ক মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আজিমপুর, ঢাকা-কে আগামী ১৫ (পনেরো) দিনের ভেতর

তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন জমা প্রদান করার জন্য বলা হলো।

৩১ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ইস্যুকৃত সুয়োমুটো রুলের ইন্টারভেনর হিসেবে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর আইনজীবী আবেদন করেন এবং আদালত তা মঞ্জুর করেন। পরে ০৫.১১.১৭ ইং তারিখে পারভীন আক্তারের (ভিকটিম) ১ নভেম্বর পর্যন্ত অবস্থান আদালতে আসক-এর আইনজীবী Affidavit of facts আকারে দাখিল করেন। বর্তমানে মামলাটি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। ■

তথ্যসূত্র

১. জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র
২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
৩. বণিক বার্তা, ২৮ মে ২০১৭
৪. যুগান্তর, ১৯ অক্টোবর ২০১৭
৫. সমকাল, ১৮ অক্টোবর ২০১৭
৬. ১৮ ও ১৯ অক্টোবর পারভীন আক্তারকে নিয়ে আসক তথ্যানুসন্ধানকারী দলের প্রতিবেদন

বিনা বিচারে আটক : মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন

মো. নাহিদ হোসেন

প্রত্যেক নাগরিকেরই সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে আইনানুযায়ী রাষ্ট্র থেকে আচরণ বা ব্যবহার পাওয়ার। কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে সে অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেয়া যেমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব তেমনি দোষী সাব্যস্ত না হলে তাকে দ্রুত সম্ভব মুক্তি দেয়াও রাষ্ট্রের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। বিনা বিচারে অর্থাৎ দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বেই জেলহাজতে আটক রাখা সম্পূর্ণরূপে আইনের শাসনের পরিপন্থি এবং নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করার শামিল। সম্প্রতি বিলম্বিত বিচার বা বিচারের দীর্ঘসূত্রিতায় সাত বছরের বেশি সময় ধরে দেশের ৬৮টি কারাগারে আটক ব্যক্তিদের তালিকা চেয়ে কারা মহাপরিদর্শককে চিঠি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি। চিঠিতে বলা হয়েছে, 'সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি দেশের উচ্চ আদালতে সরকারি আইনি সেবা নিশ্চিতকরণে কাজ করে চলছে। নিম্ন আদালতে বিচারের জন্য প্রস্তুত হওয়া মামলাসমূহ সাক্ষ্যগ্রহণসহ নানাবিধ কারণে দীর্ঘ সময় ধরে অনিষ্পত্তি অবস্থায় রয়েছে। ফলে কার্যত সাজা হওয়ার পূর্বেই আটক বন্দি দীর্ঘদিন যাবৎ কারাভোগ করছেন।[১] এর আগে গত ২৬ জুন গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার পরিদর্শনে যান প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। পরিদর্শনকালে তিনি কারাগারে বিনা বিচারে আটক বন্দিদের বিষয়ে তথ্য জানতে চান। এর পরিপ্রেক্ষিতে কাশিমপুর কারা কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। যাতে দেখা যায়, শুধু কাশিমপুর কারাগারেই হত্যা-ধর্ষণসহ গুরুতর ফৌজদারি অপরাধের ঘটনায় দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলায় বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটক আছেন প্রায় ৩৪ জন।[২] যার মধ্যে মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ের বাবুল ১৯৯৯ সালের ১৮ জানুয়ারি গ্রেপ্তার হন। এরপর থেকে তিনি কারাগারের চার দেয়ালের মধ্যে দেড় যুগ ধরে বন্দি রয়েছেন। বাবুল ছাড়াও এঁদের প্রত্যেককে প্রায় অর্ধশতবার বিচারিক আদালতে হাজির করা হয়েছে। কিন্তু জামিন মেলেনি। শেষ হয়নি মামলার বিচার কার্যক্রমও। অপরাধ প্রমাণ হয়নি কিন্তু জেল খেটেছে, এমন আরেকজন দুর্ভাগার নাম ফয়সাল আহম্মেদ। বিস্ফোরক মামলায় ২০০৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে ফয়সালকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঢাকা রেলওয়ে থানায় দায়ের করা বিস্ফোরক মামলায় জঙ্গি সংগঠন 'জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ'-এর সদস্য অভিযোগ এনে তাঁকে গ্রেফতার দেখানো

হয়। এরপর কয়েক দফা রিমান্ডে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন করে আদালতের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে তাঁকে বাধ্য করে পুলিশ। ফয়সালের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ঢাকা জেলার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারক সাইফুল ইসলাম ২০১৫ সালের ২৬ মে তাঁকে খালাস প্রদান করেন। ইতিমধ্যে বিচারের আগে ফয়সালের জীবন থেকে হারিয়ে যায় মূল্যবান ১০টি বছর।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে লজ্জাজনক উদাহরণ সৃষ্টি হয় যখন দিনের পর দিন বিনা বিচারে কারাগারে কাটানোর পর আদালত কর্তৃক খালাস আদেশ হবার পরেও মুক্তি দেয়া না হয়। তেমন অসংখ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জোবেদ আলীর মর্মান্তিক কাহিনি। সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানার কয়রা গ্রামের বাসিন্দা জোবেদ আলী বিশ্বাসকে নিজ মেয়েকে বিষ খাইয়ে হত্যার অভিযোগে ১৯৯৪ সালে ৬ সেপ্টেম্বর তালা থানা পুলিশ আটক করে। সেই থেকে তিনি জেলে ছিলেন। সাড়ে ৬ বছর পর ২০০১ সালের ১ মার্চ তার যাবজ্জীবন জেল ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে দুই বছর জেল দেওয়া হয়। এদিকে কারা নিয়ম অনুযায়ী তাকে সাতক্ষীরা থেকে যশোর জেলে পাঠানো হয়। তখন তিনি জেলে বসে তাঁর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে জেল আপিল করেন। হাইকোর্ট ২০০৩ সালের ১৯ মার্চ দেয়া রায়ে জোবেদ আলীকে নির্দোষ ঘোষণা করে এ হত্যা মামলা থেকে বেকসুর খালাস দেন। ততদিন জেলে তাঁর সাড়ে আট বছর হয়ে গেছে। আইন অনুযায়ী কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর তাঁর মুক্তি পাওয়ার

কথা থাকলেও মুক্তি দেয়া হয়নি। অভিযোগ আছে যে, ২৬ মার্চ হাইকোর্টের সেই রায় সাতক্ষীরার অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতে এসে পৌঁছায়। তৎকালীন অতিরিক্ত দায়রা জজ তাপস কুমার দে সে আদেশটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জেলে না পাঠিয়ে নথি রেকর্ড রুমে সংরক্ষণের নির্দেশ দেন।[৩] অবশেষে ২০১৬ সালের ২ মার্চ তিনি মুক্তি লাভ করেন। জোবেদ আলীর এ ব্যাপারে নিজের অনুভূতি হচ্ছে, 'আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোকে ফিরিয়ে দেবে?' তিনি আরো বলেন, 'আমার প্রতি যারা অবিচার করেছে তাদের যেন শাস্তি হয়।'

জোবেদ আলী ১৩ বছর পর মুক্তি পেলেও ফজলু মিয়াকে বিনা দোষে কারাগারের প্রকোষ্ঠে কাটাতে হয়েছে প্রায় দুই যুগ। ১৯৯৩ সালের ১১ জুলাই সিলেট আদালত প্রাঙ্গণে ঘোরাফেরা করার সময় সন্দেহবশত ৫৪ ধারার আওতায় ফজলু মিয়াকে আটক করে পুলিশ। তারপর তাঁকে পাঠানো হয় জেলহাজতে। ২০০২ সালে তাঁকে মুক্তির নির্দেশ দেন আদালত। কিন্তু তিনি মুক্তি পাননি। অবশেষে সিলেট কারাগারের সুপার বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা ব্লাস্টের সহায়তা নিয়ে ২০১৫ সালের ১৫ অক্টোবর ফজলু মিয়াকে মুক্ত করেন। জানা গেছে, ২২ বছরে তাঁকে ১৯৮ বার আদালতে হাজিরা দিতে হয়। তাঁকে যখন গ্রেফতার করা হয়েছিল তখন তিনি ছিলেন যুবক, বয়স ছিল ২৮ বছরের মতো। তিনি যখন মুক্তি পান তখন তিনি বৃদ্ধ।[৪] মুক্তির পর তাঁরও রাষ্ট্রের কাছে জীবন থেকে দীর্ঘ সময় হারিয়ে যাওয়ার সেই আক্ষেপ। ১৯৯৪ সালে পুরান ঢাকার সূত্রাপুরে দুই মহল্লার মধ্যে মারামারিতে মাহতাব নামে এক ব্যক্তির খুনের অভিযোগে শিপন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। এর পর থেকে তাঁর জায়গা হয় জেলহাজতে। পরবর্তী সময়ে একটি বেসরকারি টেলিভিশনের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে হাইকোর্ট শিপনকে কোর্টে হাজির করতে রুল জারি করেন। পরে হাইকোর্ট তাঁকে জামিন দেন। বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারক বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম বলেন, একটি মামলায় একজন আসামির ১৬ বছর ধরে বিনা বিচারে আটক থাকা রাষ্ট্রের জন্য লজ্জাজনক। বিচার বিভাগও এই লজ্জা এড়াতে পারে না। মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি হলে শিপনকে এতদিন কারাগারে আটক থাকতে হতো না। রাষ্ট্রের উচিত, মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া। কারণ মামলাটি দায়েরের পর ২২ বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু আজ অবধি নিষ্পত্তি হয়নি।[৫] আব্দুল হাকিম নামের এক ব্যক্তি ময়মনসিংহের কোতোয়ালি থানার মাইজবাড়ী এলাকার একটি হত্যা মামলায় গ্রেফতার হন ২০০১ সালে। এরপর থেকে তিনি কারাগারের চার দেয়ালের মধ্যে দেড় যুগ ধরে বন্দি রয়েছেন। আদালতে হাজিরা দিয়েছেন প্রায় ৮৪ বার। কিন্তু জামিন হয়নি। মামলা ও নিষ্পত্তি না হওয়ায় বিনা বিচারে জেলেই কাটাতে হচ্ছে আব্দুল হাকিমকে।[৬]

উল্লেখ্য, সর্বশেষ ২০১৬ সালের ৭ ডিসেম্বর কারা উপ-মহাপরিচালক (সদর দপ্তর) বজলুর রশিদ স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবেদন সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসে পাঠানো হয়। সেখানে দেখা যায়, সারা দেশে ৫৮টি কারাগারে ৪৬২ জন বিনা বিচারে বন্দি এর মধ্যে ২১ জন আছেন এক যুগেরও বেশি সময় ধরে। ৪০ জন ১০ বছর করে। আর বাকি ৪০১ জন বন্দি পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে আছেন। যাঁরা শতাধিক বার হাজিরা দিলেও শেষ হয়নি মামলার বিচার কার্যক্রম।[৭]

ফয়সাল, জোবেদ আলী বা ফজলু মিয়ার মতো নাম না জানা অসংখ্য ব্যক্তি আছেন, যাঁরা বিনা বিচারে আটক আছেন বা খালাস আদেশের পর ও জেল থেকে মুক্তি পাননি কিংবা একজনের অপরাধের জন্য অন্যজন সাজা খাটছেন। অসংখ্য ঘটনার মধ্যে যেগুলো সংবাদমাধ্যমে আসে সেগুলো নিয়ে প্রশাসন বা আদালত নড়েচড়ে বসলেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক রয়ে যায় অগোচরে।

বিনা বিচারে আটক এই নিরপরাধ মানুষগুলোকে কি আমরা তাদের অতীত ফিরিয়ে দিতে পারব? এই দায়ভার কার? বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এর দায়ভার রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে জাতীয় সংসদে বলেছিলেন, যাঁরা বিনা অপরাধে আটক রয়েছেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট আটককারী কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন। কেউ চাইলে রাষ্ট্রের কাছেও ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন। সেই বিধানও রয়েছে।[৮]

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান এবং প্রচলিত ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে দীর্ঘ সময় আটকে রাখা যাবে না। যদি বিচার প্রক্রিয়ায় সময় বেশি লাগে, তাহলে সেই অপরাধীকে জামিনে মুক্তি দেয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এই বিষয়গুলোর প্রতি যেন কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। এ ছাড়া বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দেয়ার সংস্কৃতি এখনো বাংলাদেশে তৈরি হয়নি। এমতাবস্থায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এবং নাগরিকের মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে দেশের সকল কারাগারে বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের সঠিক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে, এরপর সংক্ষিপ্ত শুনানি করে জামিনে মুক্তি দেয়ার পাশাপাশি মামলা নিষ্পত্তির জন্য নিম্ন আদালতকে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিতে হবে। যাদের আইনজীবীর মাধ্যমে মামলা লড়ার আর্থিক ক্ষমতা নেই তাদের আইনগত সহয়তা প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের যে প্রস্তাব সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস দিয়েছে, সেটি বাস্তবায়নে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন অত্যাবশ্যক। পাশাপাশি যাদের অবহেলা বা অজ্ঞতার কারণে খালাস আদেশের পরও আটক ব্যক্তিদের মুক্তি মেলেনি তাদেরকে সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্ত স্থাপন জরুরি। ■

তথ্যসূত্র

১. Bdnews24.com, ১৯ নভেম্বর ২০১৭
২. দৈনিক ইত্তেফাক, ১ ডিসেম্বর ২০১৬
৩. দৈনিক ইনকিলাব, ১১ মার্চ ২০১৬
৪. প্রাগুক্ত
৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ নভেম্বর ২০১৬
৬. দৈনিক ইনকিলাব, ১২ ডিসেম্বর ২০১৬
৭. যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০১৭
৮. প্রথম আলো, ৯ মার্চ ২০১৭

ঐশীর মামলার রায়
কিশোর অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন

আমরিন খান

গত ২২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত হয় কিশোর আপরাধের সর্বোচ্চ সাজা বনাম যাবজ্জীবন সাজাসংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর মামলা তথা ঐশী মামলার পূর্ণাঙ্গ রায়। ৭৮ পৃষ্ঠার এই পূর্ণাঙ্গ রায়ে আদালত বলেছেন, ঐশীর অপরাধ ফৌজদারি আইনের সর্বোচ্চ শাস্তি অর্থাৎ, মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য হলেও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে এ মামলায় মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে তাকে যাবজ্জীবন দণ্ড দেয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করছেন হাইকোর্ট বিভাগ। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ পাঁচটি দিক বিবেচনা করে সাজা কমিয়েছেন। এর পাঁচটি কারণও রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো: এক. মাদকাসক্ত ঐশী 'মানসিক বিচ্যুতির' কারণে জোড়া খুনের ওই ঘটনা ঘটিয়েছে। বাবা-মাকে হত্যার পেছনে তার সুস্পষ্ট কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। দুই. আসামি ঐশী অ্যাজমাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকদের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাদের পরিবারে মানসিক সমস্যার ইতিহাস রয়েছে। ঐশীর দাদি ও মামা আগে থেকেই মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। পরীক্ষা করে ঐশীর মধ্যেও সেই সমস্যা পাওয়া গেছে। তিন. ঘটনার সময়টি ছিল ঐশীর সাবালকত্ব পাওয়ার মুহূর্ত। তখন তার বয়স ছিল ১৯ বছর। চার. ওই হত্যাকাণ্ডের আগে ঐশী ফৌজদারি অপরাধ করেছে, এমন কোনো নজির নেই। পাঁচ. বাবা-মাকে হত্যার পর ঐশী পালিয়ে না গিয়ে স্বেচ্ছায় থানায় আত্মসমর্পণ করে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে, বাস্তবতা ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিচার করে হাইকোর্ট ঐশীর সাজা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানানো হয় রায়ে।

পূর্ণাঙ্গ এ রায়ে হাইকোর্ট বিভাগ তার পর্যবেক্ষণে তুলে ধরেন, 'মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নয়। এটা কার্যকর করলেই যে সমাজ থেকে অপরাধ দূর হয়ে যাবে, তা বলা যায় না। লঘুদণ্ডও অনেক সময় সমাজ থেকে অপরাধ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বা সাহায্য করে।' মাদকাসক্ত মেয়ের হাতে রহমান দম্পতির নিহত হওয়ার ওই ঘটনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আদালত অভিভাবকদেরও সচেতন হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। হাইকোর্ট বিভাগ বলেছেন, 'সন্তানদের জন্য বাবা-মা ও অভিভাবকই হলেন প্রাথমিক শিক্ষক। সে হিসেবে অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের জন্য ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সন্তানদের উপযুক্ত সময় দেয়া।' রায়ের পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট বিভাগ আরো বলেছেন, 'ঐশীর বাবা পুলিশ বিভাগে এবং মা ডেসটিনিতে চাকরি করতেন। জীবন-জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাঁরা ঐশীকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা যখন বিষয়টি উপলব্ধি করলেন, তত দিনে তাঁদের মেয়ে আসক্তিতে উচ্ছন্নে গেছে।'

ঐশীর সাজা কমানোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাণদণ্ডের সাজা নিয়েও পর্যবেক্ষণ এসেছে হাইকোর্টে বিভাগের এই বেঞ্চ থেকে। আদালত বলেছেন, 'বিভিন্ন দেশে মৃত্যুদণ্ডকে নিরুৎসাহিত করা হলেও বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড কমানোর কোনো 'গাইডলাইন' নেই। এমনকি তা বিলুপ্ত করার পরিবেশ এখনো আসেনি। শিক্ষার হার যেমন বেড়েছে, তেমনি জনসংখ্যাও বেড়েছে। এ কারণে অপরাধের প্রবণতাও বাড়ছে। এ অবস্থায় মৃত্যুদণ্ড রহিত করা যুক্তিসংগত নয়।' তবে মৃত্যুদণ্ড দিলেই যে সমাজ থেকে অপরাধ দূর হয়ে যাবে না– সে কথাও বলেছেন আদালত। 'মৃত্যুদণ্ড রহিত করতে সমাজের প্রতিটি স্তরে সুশাসন ও মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু রাষ্ট্রের মধ্যে নয়, সমাজের প্রতিটি স্তরে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।' বলে মতামত দিয়েছেন হাইকোর্ট বিভাগ।

প্রসঙ্গত, ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-৩-এর বিচারক সাঈদ আহমেদ ২০১৫ সালের ১২ নভেম্বর এ মামলার রায়ে ঐশীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। রহমান দম্পতিকে হত্যার দায়ে তাঁদের কিশোরী মেয়ের ফাঁসির আদেশ দিয়ে দ্রুত বিচার আদালত রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেছিল, 'ঐশী পরিকল্পিতভাবে, সময় নিয়ে ওই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। সে খুনের সময় সুস্থ স্বাভাবিক ছিল। আসামিপক্ষ তাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বললেও তা প্রমাণ করতে পারেনি। সে মাদকাসক্ত হলেও বাবা-মাকে সে হত্যা করেছিল সুস্থ মস্তিষ্কে।' এ বিষয়ে হাইকোর্টে বিভাগের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, 'নিম্ন আদালত সামাজিক অবক্ষয় বিবেচনায় নিয়ে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে ওই রায় দিয়েছেন। যেখানে বলা হয়েছে, একটা মেয়ে তার পিতা-মাতাকে নিজের হাতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার সাহস দেখিয়েছে। কিন্তু সাজা নির্ধারণ ও বিচারের ক্ষেত্রে এ ধরনের আবেগ প্রদর্শনের সুযোগ নেই। আদালত আইনগত তথ্য ও প্রমাণ বিবেচনায় নেবেন, যেখানে একজন নারী ১৯ বছর বয়সে এ ধরনের অপরাধ করেছে।' এরপর গত ৫ জুন ২০১৭ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ঐশীর মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে সেই সঙ্গে ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন। আর বাবা-মাকে খুনের পর যে বন্ধুর বাসায় ঐশী আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই মিজানুর রহমান রনিকে দেয়া হয় দুই বছরের কারাদণ্ড। রায়ে রনির দুই বছরের সাজার রায় হাইকোর্টও বহাল রেখেছেন। ওই রায়ের বিরুদ্ধে ঐশীর আপিল ও ডেথ রেফারেন্সের শুনানি শেষে বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন সেলিম ও বিচারপতি মো. জাহাঙ্গীর হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ সোমবার, ৫ জুন এ রায় ঘোষণা করেন। হাইকোর্টে এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জহুরুল হক জহির; তাঁর সঙ্গে ছিলেন

আদালতে নেওয়া হচ্ছে ঐশীকে

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল আতিকুল হক সেলিম। অন্যদিকে ঐশীর পক্ষে ছিলেন সুজিত চ্যাটার্জি বাপ্পী।

রায়ের পর সুজিত চ্যাটার্জি বাপ্পী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আপিলের রায়ে আমাদের প্রত্যাশা আরো বেশি ছিল। কারণ ঘটনার সময় ঐশী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল এবং তার আচরণগত সমস্যা ছিল। তার বয়সও বিবেচ্য ছিল। যা-ই হোক, উচ্চ আদালত যে রায় দিয়েছেন, তা অবশ্যই সকলের জন্য পালনীয়। তবে আরো ভালো পর্যবেক্ষণের প্রত্যাশা ছিল আমাদের।' ঐশীর নিযুক্ত এই আইনজীবী আরো বলেন, ঐশীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তিনি আভাস পেয়েছেন, তারা সর্বোচ্চ আদালতে আপিলে যেতে চান। ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জহিরুল হক জহির বলেন, বিচারিক আদালত ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ঐশীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। আর তার এক সহযোগীকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। 'রাষ্ট্রপক্ষ উচ্চ আদালতে ৩০২ ধারায় ঐশীর অপরাধ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং আদালত ৩০২ ধারার কনভিকশনটা বহাল রেখেছেন। তবে বাস্তবতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দিয়েছেন।'

কিশোরী মেয়ে ঐশীর হাতে এসবি কর্মকর্তা মাহফুজ ও তাঁর স্ত্রীর হত্যার ঘটনা চার বছর আগে নাড়িয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশকে। বর্তমান সময়ের শিশু-কিশোরদের বেড়ে ওঠা এবং তাতে অভিভাবকদের ভূমিকা নিয়েও সে সময় নানা প্রশ্ন ওঠে। আলোচ্য এ মামলার রায়ে হাইকোর্ট বিভাগ বলেছেন, ঐশীর অপরাধ মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য হলেও তার বয়স ও মানসিক স্বাস্থ্য-পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সাজা কমানোর এই রায় দেয়া হয়েছে। ■

আশিয়ান সিটি প্রকল্পের কার্যক্রমে আপিল বিভাগের নিষেধাজ্ঞা

জাকিয়া সুলতানা

আইন ও সালিশ কেন্দ্র, এএলআরডি, বেলা, ব্লাস্ট, বাপা, আইএবি, নিজেরা করি এবং পবা– এ আটটি মানবাধিকার এবং পরিবেশবাদী সংগঠন আশিয়ান সিটি প্রকল্পটির সপক্ষে প্রদত্ত রাজউক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র চ্যালেঞ্জ করে ২০১২ সালে একটি জনস্বার্থমূলক মামলা (রিট পিটিশন নং ১৭১৮২/২০১২) দায়ের করে। মামলার চূড়ান্ত শুনানি শেষে মহামান্য আদালত ১৬ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে এ সকল অনুমোদন ও আশিয়ান সিটি প্রকল্প অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন। আশিয়ান ল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট লি. কর্তৃক প্রকল্পের জন্য ল্যান্ড হোল্ডিং লিমিটেশন অর্ডার ১৯৭২ এবং এগ্রিকালচার রিফর্ম অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩-তে নির্ধারিত ভূমির পরিমাণের সর্বোচ্চ সিলিংয়ের জন্য জমির মালিকানা আইনবহির্ভূত মর্মেও রায় প্রদান করেন।

রায়ের সংশোধনী চেয়ে আশিয়ান ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লি. রিভিউ আবেদন দাখিল করলে গত ১৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখে আদালত তা আমলে নিয়ে আশিয়ান সিটি প্রকল্প অবৈধ ঘোষণা করে প্রদত্ত ১৬ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের রায় বাতিল করে রিভিউ আবেদনের রায় প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে উল্লিখিত সংগঠনগুলো অন্তর্বর্তীকালীন আপিল (সিএমপি) দায়ের করলে গত ২২ আগস্ট, ২০১৬ আশিয়ান সিটি প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন আপিল বিভাগ। সেই সঙ্গে আপিল বিভাগ মামলার বাদীগণকে নিয়মিত আপিল দায়েরের নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে উল্লিখিত সংগঠনের এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগের বেঞ্চ গত ৭ আগস্ট ২০১৭ আশিয়ান সিটির পক্ষে প্রদত্ত হাইকোর্টের রিভিউ আবেদনের রায় স্থগিত করেন। একই সঙ্গে উত্তরখান, দক্ষিণখান, বরুয়া ও বাউথার মৌজায় প্রস্তাবিত 'আশিয়ান সিটি' প্রকল্পের সকল কার্যক্রম (বিজ্ঞাপন, মাটি ভরাট, প্লট বিক্রয়, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি)-এর ওপর পূর্বে অর্থাৎ ১৬

জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে প্রদত্ত রায়ের নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখেন।

উল্লিখিত সংগঠনসমূহ আশিয়ান সিটি ডেভেলপমেন্ট লি.-এর বিরুদ্ধে জলাশয় আইন, ২০০০; পরিবেশ আইন, ১৯৯৫; ল্যান্ড হোল্ডিং লিমিটেশন অর্ডার, ১৯৭২; এগ্রিকালচার ল্যান্ড রিফর্ম অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩; বেসরকারি আবাসন প্রকল্প (ভূমি উন্নয়ন) বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২) এবং রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে। একই সঙ্গে প্রকল্প অনুমোদনে পূর্ত মন্ত্রণালয়, পরিবেশ মন্ত্রণালয়, রাজউক এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে অস্বচ্ছতা এবং ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়।

উল্লেখ্য, রাজউক ২০০৭ সালে জলাশয় ভরাটের অভিযোগে আশিয়ান সিটি প্রকল্পের বিরুদ্ধে জলাশয় আইনে মামলা দায়ের করে। পরবর্তী সময়ে রাজউক শুনানিতে হাজিরা না দেয়ায় মামলাটি আশিয়ান সিটির সপক্ষে খারিজ হয়ে যায়, যার বিরুদ্ধে রাজউক কোনো আপিল করেনি। বিভিন্ন সময়ে রাজউক এ প্রকল্প অননুমোদিত বিধায় এতে প্লট না কিনতে ক্রেতাসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি মারফত অনুরোধ জানায়। পরিবেশ অধিদপ্তরও জলাশয় ভরাটের অভিযোগে পরিবেশ আইনের অধীনে আশিয়ান সিটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করে। আশিয়ান সিটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষের আপিল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কোনোরূপ যৌক্তিক কারণ না দেখিয়ে সেই জরিমানা কমিয়ে ৫ লক্ষ টাকা প্রদানের নির্দেশ দেয়। আশিয়ান সিটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভূমিদস্যুতার অভিযোগ উঠলে জেলা প্রশাসক, ঢাকা একটি প্রতিবেদন প্রদান করেন, যাতে দেখা যায় যে মাত্র ৪১ একর জমির সপক্ষে কিছু কাগজাদি দেখাতে পারলেও আশিয়ান সিটির নামে ভরাটকৃত প্রায় ২৩০ একর ভূমির কোনো তথ্য দিতে পারেনি। অধিকন্তু জেলা প্রশাসকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ভরাটকৃত জমিতে সরকারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি রয়েছে। আশিয়ান সিটি প্রকল্পের জন্য ভরাটকৃত জমি বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী 'প্লাবনভূমি'। রাতের অন্ধকারে আশিয়ান সিটি প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষের বাড়ির দেয়াল ভেঙে ও জমি দখল করে কোম্পানির সাইনবোর্ড টানিয়ে ভূমিদস্যুতা করতে থাকে। ভুক্তভোগী জমির মালিকদের বারবার অভিযোগ সত্ত্বেও আশিয়ান সিটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জমি দখলের ব্যাপারে রাজউক, পুলিশ বা ভূমি প্রশাসন কেউ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

ইতিপূর্বে দায়েরকৃত রিট মামলা (নং ৬০৭২/২০১০)-এর চূড়ান্ত শুনানি শেষে আদালত গত ৮ জুন ২০১১ তারিখে সকল অননুমোদিত বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের প্লট ও ফ্ল্যাট বিক্রয়ের লক্ষ্যে প্রচারিত বিজ্ঞাপন ও এই সংক্রান্ত সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড অপসারণ করতে নির্দেশ দিয়ে রায় প্রদান করেন। এ মামলায় অননুমোদিত ৭২টি আবাসন প্রকল্পের মধ্যে 'আশিয়ান সিটি' প্রকল্প ছিল একটি।

উল্লিখিত মামলার (নং ৬০৭২/২০১০) রায়ে আশিয়ান সিটির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও ভুক্তভোগী জনসাধারণের অভিযোগ, রাজউকের অননুমোদিত ও জলাশয় ভরাটকৃত আবাসনের তালিকায় থাকা সত্ত্বেও রাজউক ৪ অক্টোবর ২০১২ তারিখে ২০টি শর্ত সাপেক্ষে এ প্রকল্পের অনুমোদন দেয়। প্রকল্পের জমির শতভাগ মালিকানা না থাকা এবং প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন ছাড়াই শর্ত সাপেক্ষে প্রদত্ত এ অনুমোদন ২০০৪ সালের বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালার স্পষ্ট লঙ্ঘন। সেই সঙ্গে আশিয়ান সিটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে জলাশয় ভরাটের অভিযোগে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করে এবং বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক আশিয়ান সিটি প্রকল্প এলাকাকে প্লাবন ভূমি বর্ণনা করা সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে এ প্রকল্পের সপক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র স্ববিরোধী এবং বেআইনি। ■

ধর্ষণ সম্পর্কে ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের রায়

আমরিন খান

গত ১১ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত জানায় ১৫ নয়, স্ত্রীর বয়স ১৮-এর নিচে হলেই যৌন মিলন ধর্ষণ। ঐতিহাসিক এই রায়ে আদালত বলেন যে, যদি কোনো পুরুষ তার ১৮ বছরের কম বয়সি স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হন, তাহলে সেই ব্যক্তি আইনের চোখে অপরাধী। তবে এমন ঘটনা ঘটার এক বছরের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে হবে। এই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত স্বামীর ১০ বছর কারাদণ্ড থেকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে ভারতের The Protection of Children from sexual offences (POCSO) Act-এর অধীনে। উল্লেখ্য, এই আইন অনুযায়ীও ১৮ বছরের নিচের কোনো নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক ধর্ষণ। বিচারপতি মদন বি. লকার এবং দীপক গুপ্তের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে এই রায় প্রদান করেন।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৫ অনুযায়ী, কোনো পুরুষ ১৮ বছরের কম বয়সের কোনো মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হলে তা অপরাধের আওতায় পড়ে। কিন্তু সেই মেয়ে যদি তার বিবাহিত স্ত্রী হয়, তাহলে মেয়েটির ইচ্ছা বা সম্মতি না থাকলেও তা ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হতো না ভারতের দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৫-র ব্যতিক্রম নং-২ ধারার কারণে, যদিও ভারতে বাল্যবিবাহ আইনসম্মত নয়। যুগান্তকারী এই রায়ের পর IPC (Indian Penal Code)-এর ধারা ৩৭৫-এর ব্যতিক্রম নং-২ ধারা অনুযায়ী ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক ধর্ষণ নয়। অর্থাৎ ১৮ বছরের কমবয়সি স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক বা

যৌন মিলন ধর্ষণ বলে গণ্য হবে। এই রায়ের পূর্বে ধারাটি ছিল এমন ১৫-১৮ বয়সি স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক ধর্ষণ নয়।

৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিল যে, ১৮ বছরের নিচে যৌনতা নিয়ে পারস্পরিক সম্মতিকে সমর্থন করে সংসদ কীভাবে ছাড় দেয়ার পক্ষে যেতে পারে? আদালত স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন, বৈবাহিক ধর্ষণ নিয়ে তাঁরা কিছু মন্তব্য করবেন না। তবে ১৮-র নিচে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে 'সব দিক বিচার' করা হবে। তখনই দণ্ডবিধির ব্যতিক্রম নিয়ে কেন্দ্রের মতামত জানতে চান আদালত। কেন্দ্রের পক্ষে আইনজীবী যুক্তি দেন এই ছাড় তুলে দিলে বৈবাহিক ধর্ষণ নিয়ে অভিযোগের দরজা খুলে যাবে, ভারতে যার অস্তিত্ব নেই। আবেদনকারীরা বলেন যে, দণ্ডবিধির উক্ত ধারাটি POCSO এবং Prohibition of Child Marriage Act এবং ভারত যেসব আন্তর্জাতিক দলিলে অনুস্বাক্ষর করেছে তার লঙ্ঘন। উল্লেখ্য, Independent Thought নামের একটি NGO গত আগস্ট ২০১৭ তারিখে উক্ত পিটিশনটি দায়ের করে। POCSO আইনটির বিধান অনুযায়ী সম্মতি প্রদানের বয়স হলো ১৮।

আদালত ভারতে প্রচলিত দুটি আইনের মধ্যে অসামঞ্জস্য তুলে ধরে বলেন যে, দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৫-এর ব্যতিক্রমী ২ উপধারা অনুযায়ী ১৫-১৮ বছর বয়সি স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সংসর্গ ধর্ষণ হিসেবে গণ্য না হলেও এটি POCSO আইনের ধারা ৬ অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ছাড়াও POCSO আইনটির ধারা ৪২-এ অনুযায়ী এই আইনের কোনো বিধান যদি দেশে প্রচলিত অন্যান্য আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, POCSO আইনটির বিধান প্রাধান্য পাবে। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি দীপক গুপ্ত বলেন, 'যেহেতু POCSO একটি বিশেষ আইন, যার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো শিশুরা, তাই দেশে প্রচলিত অন্য যে-কোনো ফৌজদারি আইন তথা দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৫ এর ২ নং ব্যতিক্রম-এর ওপর POCSO-এর বিধানাবলি প্রাধান্য পাবে।' আদালত তাঁর পর্যবেক্ষণে আরো বলেন, দণ্ডবিধির উক্ত ধারাটি একজন বিবাহিত শিশু এবং অবিবাহিত শিশুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, যার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তবে আদালত এটি স্পষ্ট করে দেন যে, আলোচ্য মামলা এবং রায়টি বৈবাহিক ধর্ষণ নিয়ে আলোচনা করে না। রায়টি শুধু অপ্রাপ্তবয়স্ক/বিবাহিত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ বৈবাহিক ধর্ষণ বিষয়টি উক্ত আবেদনের মাধ্যমে আদালতের সামনে উত্থাপিত হয়নি। বিচারপতি দীপক গুপ্ত আরো বলেন যে, 'বিবাহসংক্রান্ত আইনে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ কিন্তু দণ্ডবিধির উক্ত ধারাটি তার একটি ব্যতিক্রম, যা বাস্তবিক অর্থে হেঁয়ালি, যথেচ্ছ এবং মেয়েশিশুদের অধিকারের লঙ্ঘন। দণ্ডবিধির উক্ত ধারাটি ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫ ও ২১-এর লঙ্ঘন।'

রায় প্রদানকালে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত দেশে প্রচলিত সকল শিশুসংক্রান্ত আইন, যেমন– The Juvenile Justice Act, The Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO), The Prohibition of Child Marriage Ges Indian Penal Code-এ বিদ্যমান অসামঞ্জস্যগুলোকে দূর করতে বলেছেন। বিশেষত, যে বিষয়গুলো ১৮ বছরের নিচের শিশুদের সঙ্গে যৌন সংসর্গবিষয়ক।

দেশে বাল্যবিবাহ একটি বাস্তবতা এবং এ ধরনের বাল্যবিবাহ রক্ষা করা উচিত– ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের এমন আবেদন প্রত্যাখ্যান করে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বলেন, 'ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার ব্যতিক্রমী ২ উপধারাকে কাজে লাগিয়ে স্বামীদের সুরক্ষা দেয়া সংবিধান লঙ্ঘনের সমতুল্য এবং সেটা নাবালিকার মৌলিক অধিকার খর্ব করে।' এই রায়ের ফলে ভারতের ২ কোটি ৩০ লক্ষ বালিকা বধূ যৌনসংসর্গ বিষয়ক অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে আইনি সুরক্ষা পাবে বলে আশা করা যায়।

ভারতের মতো দেশে আজও বহু স্থানে সামাজিকভাবে বাল্যবিবাহের স্বীকৃতি দেয়া হয়। ২০০১ সালে জনগণনার পর ভারতে বাল্যবিবাহ কমেছে বলে সরকারিভাবে দাবি করা হলেও ২০১১-তে এসে দেখা যায় পরিস্থিতি ভয়ানক। এখনো সেখানে প্রতি তিনজন বিবাহিত নারীর মধ্যে একজন নারীর বিয়ে হয়েছে নাবালিকা অবস্থায়। ভারতের 'জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা'র (এনএসএইচএস) দেখা গেছে, ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সি বিবাহিত নারীদের ৪৬ শতাংশেরই বিয়ে হয়েছিল ১৮ বছরের আগে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

আমাদের দেশে ধর্ষণসংক্রান্ত মামলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধন ২০০৩)-এর অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু ধর্ষণের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ১৮৬০ সালে প্রবর্তিত দণ্ডবিধির ৩৭৫ নং ধারা ব্যবহৃত হয়। ৩৭৫ ধারা অনুযায়ী ধর্ষণের সংজ্ঞায় পাঁচটি ক্ষেত্রে কোনো নারীর সঙ্গে যৌন সহবাস করলে তা ধর্ষণ বলে গণ্য করা হবে। ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে–

১. তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে;
২. তার সম্মতি ব্যতিরেকে;
৩. মৃত্যু বা আঘাতের ভয় দেখিয়ে যদি সম্মতি আদায় করে;
৪. কোনো অচেনা পুরুষ যদি কোনো নারীকে তার স্বামী বলে প্রতারণা করে সেই নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং
৫. ষোলো বছরের কম বয়সি কোনো মেয়ের সঙ্গে তার সম্মতিসহ সহবাস করে।

উক্ত ধারাটির ব্যাখ্যায় এটা বলা হয়েছে যে, ধর্ষণ অপরাধের জন্য যৌনাঙ্গ প্রবেশ করানোই যথেষ্ট। লিঙ্গের অতি অল্প অনুপ্রবেশও ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হবে। বাস্তবে দেখা যায়, ধর্ষণ শুধু এই পাঁচটি ক্রিয়াকর্ম বা শর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না এবং অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম বা শর্তের মাধ্যমেও নারী ও শিশুকে যৌন অত্যাচারের শিকার হতে হয়।

আমাদের দেশে ধর্ষণের বিচারসংক্রান্ত বিধিবিধান যে চারটি আইন রয়েছে, যেমন– দণ্ডবিধি, ১৮৬০; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধন-২০০৩); ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮; সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২; এসব আইনের কোথাও ধর্ষণের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে দণ্ডবিধিতে উল্লিখিত পাঁচটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য কার্যকলাপকে ধর্ষণের আওতাভুক্ত করা হয়নি। যার ফলে দণ্ডবিধির পাঁচটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য কার্যকলাপ, বৈবাহিক ধর্ষণ প্রভৃতি কোনো আইনের আওতা তথা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। এর মানে এটা দাঁড়ায় যে, ষোলো থেকে বেশি বয়সি কোনো মেয়ের

সঙ্গে (স্ত্রীর সঙ্গে) তার সম্মতি ছাড়া যৌনসম্পর্ক স্থাপন করলে সেটি আমাদের দেশে ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হবে না।

বৈবাহিক ধর্ষণ

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিল যেমন– Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966, Convention on Elimination of all sorts of Discrimination Against Women (CEDAW) ১৯৭৯ প্রভৃতি কনভেনশনে উল্লেখ আছে– সকল মানুষ সমান এবং প্রত্যেকের আইনের সুরক্ষা লাভের সমান অধিকার রয়েছে। কারো সঙ্গে অন্যায়ভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল বৈবাহিক ধর্ষণকে নারী নির্যাতনের একটি রূপ হিসেবেই শুধু চিহ্নিত করেনি, এ ধরনের অপরাধকে নারীর মানবাধিকারের লঙ্ঘন বলেও স্বীকৃতি দিয়েছে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য রোধে গৃহীত সিডও সনদের ১ নং অনুচ্ছেদে, নারীর প্রতি বৈষম্য বলতে বুঝিয়েছে, 'পুরুষ-নারী ভিত্তিতে যে-কোনো পার্থক্য, বঞ্চনা অথবা বিধিনিষেধ যার মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে, পুরুষ প্রভাব বা উদ্দেশ্য রয়েছে। উক্ত সনদের ৬ নং অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে, 'পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ নারীকে নিয়ে সব ধরনের অবৈধ ব্যবসা অথবা দেহব্যবসার আকারে নারীর শোষণ দূর করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে'। এ ছাড়া নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নিরোধসংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণার ২ নং অনুচ্ছেদে বৈবাহিক ধর্ষণকে নারীর প্রতি সহিংসতার একটি ধরন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একইভাবে ১৯৯৫ সালে চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনেও বৈবাহিক ধর্ষণকে নারী নির্যাতনের অন্যতম হাতিয়াররূপে গণ্য করা হয়েছে। বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশনের ১০(গ) নং অনুচ্ছেদেও বৈবাহিক ধর্ষণকে নারীর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং একে নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার পাশাপাশি এ প্রসঙ্গে প্রচারণা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

তা ছাড়াও সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার (১৯৪৮) ১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষই মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকারী। তেমনি মানব পরিবারের প্রতিটি সদস্যই আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং কোনোরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকেই প্রত্যেকের আইনের সুরক্ষা লাভের সমান অধিকার রয়েছে। আইসিসিপিআর-এর ১ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রত্যেকের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে এবং ৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কাউকেই দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি করা যাবে না। যেহেতু এসব অধিকার সকলের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে, তাই নারীরাও তার বাইরে নয়। এ ক্ষেত্রে বিবাহিত ও অবিবাহিত নারীর মধ্যে সেই অধিকারগুলোর ভোগে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, ২০০২ সালের ২ মে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথমবারের মতো নেপাল সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ মঞ্চ ফোরাম ফর উইমেন, ল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এফডব্লিউএলডি) বনাম নেপাল সরকার মামলায় এক যুগান্তকারী রায় প্রদান করে। যুগান্তকারী এই রায়ে স্ত্রীর বিনা সম্মতিতে স্বামী কর্তৃক বলপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনকে ধর্ষণের সমতুল্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আদালতের উক্ত সিদ্ধান্ত মতে, যৌন সম্পর্কের জন্য স্ত্রীর ওপর বল প্রয়োগকারী স্বামীরা এখন থেকে যথাযথই ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত হবেন। বৈবাহিক ধর্ষণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আদালত পর্যালোচনা করেন যে, 'আইন সম্মতিকেই বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাই সম্মতি ব্যতীত কোনো বিবাহ সম্পাদন করা যেতে পারে না, তেমনিভাবে বিবাহ-পরবর্তী শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনকালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি একান্তভাবে জরুরি। সম্মতি ব্যতীত এবং শক্তি প্রয়োগপূর্বক স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ধর্ষণের পর্যায়ে পড়ে।' এরপর বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে আদালত তাঁর রায়ে বলেন, 'একজন নারীর বিয়ে করার অর্থ এই নয় যে, সে দাসীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিয়ের কারণে তাই একজন নারী তার মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন না। কোনো স্বামীকে স্ত্রী ধর্ষণের অধিকার দেয়ার অর্থ সেই স্ত্রীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার এবং সর্বোপরি তার স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার করা...এ ছাড়া মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের আলোকে বলা যায়, বৈবাহিক ধর্ষণ আইনের দৃষ্টিতে বৈধ হতে পারে না।' ■

তথ্যসূত্র

১. http://www.hindustantimes.com/india-news/sex-with-wife-below-18-years-to-be-considered-rape-says-supreme-court/story-H9KZrDTbNJOivOkvXTobtI.html
২. http://www.firstpost.com/india/supreme-court-declares-sex-with-wife-below-18-illegal-men-may-face-10-year-imprisonment-or-lifer-4136995.html
৩. http://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/111017/sc-says-sex-with-wife-below-18-yrs-a-punishable-offence-under-ipc.html
৪. http://www.thehindu.com/news/national/sex-with-minor-wife-is-rape-says-supreme-court/article19838085.ece
৫. https://www.ndtv.com/india-news/sex-with-wife-below-18-can-be-punished-with-life-imprisonment-supreme-court-1762323
৬. http://indianexpress.com/article/india/sex-with-child-wife-below-18-years-is-rape-supreme-court-4885687/
৭. http://www.anandabazar.com/national/sexual-intercourse-with-below-18-yr-old-wife-is-rape-dgtl-1.688055
৮. http://lawyersclubbangladesh.com/bangla/2017/10/11/
৯. http://www.bhorerkagoj.net/2017/10/11/
১০. http://www.dw.com/bn/

পার্বত্য চুক্তির বিশ বছর
একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

এ. কে. এম বুলবুল আহমেদ

গত ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ২০ বছর পূর্ণ হলো। পাহাড়ে চলমান রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'উপজাতি' অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জনের বিষয়টির প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরকারী সরকার ও জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে, তাতে বেশ ব্যবধান বিদ্যমান। চুক্তির অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করেছে সরকার। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হচ্ছে, পাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পার্বত্য চুক্তিতে যা আছে

চারটি খণ্ডে বিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ক' খণ্ডে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'উপজাতীয়' অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া; চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট 'চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি; চুক্তি অনুসারে আইনের সংশোধন এবং চুক্তির কার্যকারিতার মেয়াদের কথা উল্লেখ রয়েছে। 'খ' খণ্ডের ৩৫টি অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'অ-উপজাতীয়' বাসিন্দা সংজ্ঞা নির্ধারণ; পার্বত্য এলাকায় জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পরিষদের পূর্বানুমোদনের বাধ্যবাধকতা, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি স্বতন্ত্র ভোটার তালিকা প্রণয়ন; সার্কেল 'চিফ' কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদ প্রদান; স্থানীয় পরিষদসমূহের কাছে চুক্তিতে প্রতিশ্রুত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ (সাধারণ ও ভূমি প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা, উন্নয়ন ইত্যাদি) কার্যকর নির্বাহী ক্ষমতা হস্তান্তর; পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পুলিশ ও পরিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে 'উপজাতীয়দেরকে' অগ্রাধিকার প্রদান। 'গ' খণ্ডে ১৪টি অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন; আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনমাফিক আইন প্রণয়ন; পার্বত্য অঞ্চলের জন্য নতুন আইন কিংবা গৃহীত আইনের সংশোধনের জন্য আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশের ক্ষমতা। 'ঘ' খণ্ডে ১৯ টি অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের চিহ্নিত করে একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসন; ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একটি কমিশন গঠন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি; 'উপজাতীয়দের' মধ্য থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় গঠন; ছয়টি স্থায়ী সেনানিবাস ব্যতীত সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার এবং সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাসের পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিক অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সদস্যদের পুনর্বাসন; শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির পর ভূমিহীন পাহাড়িদের মধ্যে ভূমি বণ্টন; পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ ও অবকাঠামো বাস্তবায়ন; সরকারি চাকরি ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত 'উপজাতীয়দের' জন্য কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখা, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ দেয়া।

চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা

পার্বত্য চুক্তি অনুসারে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ; ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য টাস্কফোর্স এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করেছে। চুক্তিতে 'মন্ত্রী'র কথা উল্লেখ থাকলেও ২০০২ সাল থেকেই পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে পূর্ণমন্ত্রী নেই।[১] চুক্তি স্বাক্ষরের ২০ বছর পরও পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদকে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। তার পর্যাপ্ত লোকবল নেই, অর্থবল নেই, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা নেই। স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। আঞ্চলিক পরিষদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো কার্যবিধি এখনো পর্যন্ত প্রণীত হয়নি। অন্যদিকে ২০০১ সালের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি আইনের পার্বত্য চুক্তির সঙ্গে বিরোধাত্মক ধারাগুলো গত বছর সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু আইন প্রণয়নের ১৬ বছর পার হয়ে গেলে বাস্তবায়নের জন্য কোনো বিধিমালা এখনো হয়নি। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় আরো কিছু সমস্যা রয়েছে। যেমন টাস্কফোর্স গঠন হলেও ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। অথচ ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা তাঁদের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক গৌতম দেওয়ান তার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, পার্বত্য চুক্তিতে উল্লিখিত ৩৩টি কার্যাবলির মধ্যে গত ২০ বছরে পাঁচটি পূর্ণাঙ্গভাবে এবং ১২টি চুক্তির মাধ্যমে আংশিকভাবে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে; ১২টি কার্যাবলির ২৪টি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং ২২টি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি (ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় পুলিশ, স্থানীয় পর্যটন ইত্যাদি) হস্তান্তরিত হয়নি এবং হস্তান্তরিত ১২টি কার্যাবলির বিভিন্ন কর্ম, দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অবকাঠামো, বেতন-ভাতা ইত্যাদি বিষয়াদি হস্তান্তরিত হয়নি। উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, ৯ হাজার ৭৮০ ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী পরিবার কর্তৃক তাদের জায়গাজমির আংশিক বা সম্পূর্ণ ফেরত না পাওয়া, ছয়টি সেনানিবাস ছাড়া বাকি অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার ও জমিজমা হস্তান্তরের বিষয়গুলোতে এখনো যথেষ্ট অগ্রগতি নেই। জনসংহতি সমিতির ভাষ্য অনুযায়ী পাঁচ শতাধিক অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পের মধ্যে ১০৫টি প্রত্যাহার করা হয়েছে, যদিও ২০১৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সংসদে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন, 'শান্তি' (পার্বত্য) চুক্তি স্বাক্ষরকালীন ২৩২টি অস্থায়ী সেনাক্যাম্প থেকে গত ১৭ বছরে ১১৯টি সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকটের প্রেক্ষাপট, এ অঞ্চলের বিশেষত্ব এবং এর রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস সম্পর্কে সরকারি প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঠিক ধারণা না থাকাও চুক্তি বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় বলে পাহাড়ি নেতারা মনে করেন। গৌতম দেওয়ান তাঁর প্রবন্ধে[২] উল্লেখ করেন, দেশের স্থিতিশীলতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার দোহাই দিয়ে চুক্তির বিরোধিতা করার প্রবণতা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে ২৯ নভেম্বর ২০১৭ রাজধানীর সুন্দরবন হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে পিসিজেএসএস সভাপতি সন্তু লারমা অভিযোগ করে বলেন[৩], 'পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত গোয়েন্দা বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা ক্ষমতাসীন দলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকা পালন করে চলেছে।'

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের বক্তব্য

পার্বত্য চুক্তির ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১ ডিসেম্বর ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তির বেশির ভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। চুক্তির ৭২ শর্তের ৪৮টির ধারা এরই মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১৫ শর্তের আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকি ৯ শর্ত বাস্তবায়নের চলমান প্রক্রিয়ায় রয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে কুচক্রী মহল নানা কথা বলে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। শেখ হাসিনা বলেন, পাহাড়ে সুষম উন্নয়ন ও আয়বৈষম্য কমিয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্মাণ করতেই চুক্তি করেছিলাম। তবে ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না আসায় চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়েছে। তবে সংবিধানের বাইরে কিছু করা হবে না। শান্তিচুক্তির আলোকে মোতায়েন করা সেনাবাহিনীর সব অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ছয়টি গ্যারিসন দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, রুমা ও আলীকদমে প্রত্যাবর্তনের বিধান রয়েছে। এ লক্ষ্যে গ্যারিসনসমূহের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন চলছে।[৪]

অন্যদিকে চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় ২০ বছরে পার্বত্য এলাকা জনমিতি বদলে যাচ্ছে দাবি করে জনসংহতির সমিতির সভাপতি সন্তু লারমার অভিযোগ– পাহাড়িরা নিজ ভূমিতে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত করার চক্রান্ত চলছে। তিনি বলেন, চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি বাস্তবায়ন হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি। 'সেটেলার' বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন করা হয়নি। ভারতে আশ্রয় নেয়া জুম্ম শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন করা হয়নি। সন্তু লারমা আরো অভিযোগ করেন, জুম্মদের তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উৎখাতসহ বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস চলছে। গত বছর 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন' সংশোধনের এক বছর পরও বিধিমালা হয়নি। পূর্বের চেয়ারম্যানের মেয়াদ শেষ হলেও নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হয়নি। কমিশনের প্রয়োজনীয় জনবল ও তহবিল নেই। ফলে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক কাজও বন্ধ রয়েছে।[৫]

শেষ কথা

এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ে দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংঘাত ও অচলাবস্থার

অবসান হয়েছে। সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে বেশ কিছু পদক্ষেপও নিয়েছে, এর মাধ্যমে পাহাড়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে, অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। তবে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি এবং স্থানীয় পরিষদের হাতে চুক্তিতে উল্লিখিত কার্যাবলি হস্তান্তরের বিষয়ে এখনো তেমন অগ্রগতি নেই। অন্যদিকে উন্নয়নের নামে নির্বিচারে পাহাড়-বন ধ্বংস করার পরিণাম যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তার আলামত পাওয়া গেছে বিগত বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ধসে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। পাহাড়ের সবুজ আচ্ছাদন বিনষ্ট হওয়ার কারণে পাহাড়ে পানীয় জল এবং খাদ্যের সংকট দেখা দিচ্ছে। নির্বিচারে পাহাড় ও বন ধ্বংসের এই ভয়াবহ প্রবণতা রোধ না করতে পারলে ভবিষ্যতে আরো বড় দুর্যোগ নেমে আসতে পারে। জনসংখ্যার ভারসাম্য নিয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে ভয় ও শঙ্কা আছে, তা দূর করতে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। সরকারের প্রশাসনসহ সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, ঐতিহাসিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি বিশেষায়িত অঞ্চলের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে আর দশটি এলাকার মতো সাধারণীকরণ না করে, একটি বিশেষ অঞ্চল হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে, যা পার্বত্য চুক্তিকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে, দেশের প্রচলিত আইন ও উচ্চ আদালতের বিভিন্ন রায়ে এর স্বীকৃতি রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য পার্বত্য চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। ■

তথ্যসূত্র

১. ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে গত ২৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে আয়োজিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০ বছর: পার্বত্যবাসীর ভূমি অধিকার সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক গৌতম দেওয়ান কর্তৃক উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ।
২. প্রাগুক্ত
৩. বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর, ২৯ নভেম্বর ২০১৭ (https://bangla.bdnews24. com/ bangladesh/ article14 28058.bdnews)
৪. যুগান্তর, ২ ডিসেম্বর ২০১৭
৫. প্রথম আলো, ৪ ডিসেম্বর ২০১৭, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

ইলিশের 'ভৌগোলিক নির্দেশক' স্বত্ব পেল বাংলাদেশ

তাবাস্সুম মখ্দুমা

জামদানির পর এবার বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন (জিআই) পণ্য হিসেবে আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন স্বীকৃতি পেয়েছে জাতীয় মাছ ইলিশ। ফলে এখন থেকে ইলিশ বাংলাদেশের নিজস্ব পণ্য হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত হবে।

গত ২৪ আগস্ট ২০১৭ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু আনুষ্ঠানিকভাবে সনদটি মৎস্য অধিদপ্তরের কাছে দিয়েছেন। অধিদপ্তরের পক্ষে মহাপরিচালক সৈয়দ আরিফ আজাদ এটি গ্রহণ করেন।

'ভৌগোলিক নির্দেশক' হচ্ছে– একটি প্রতীক বা চিহ্ন, যা পণ্য ও সেবার উৎস, গুণাগুণ ও সুনাম ধারণ ও প্রচার করে। আর 'ভৌগোলিক নির্দেশক' পণ্যের মালিকানা বিশ্ববাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর সঙ্গে পণ্যের রপ্তানি-সক্ষমতা জড়িত। যাদের জিআই পণ্য যত বেশি, তাদের রপ্তানি সক্ষমতাও তত বেশি।

২০১৬ সালে বাংলাদেশের প্রথম 'ভৌগোলিক নির্দেশক' পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় জামদানি শাড়ি। আর ইলিশ দ্বিতীয় পণ্য, যা শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর থেকে এ সনদ পেল।

এর আগে মৎস্য অধিদপ্তর পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরের কাছে রুপালি ইলিশকে 'ভৌগোলিক নির্দেশক' পণ্য হিসেবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। ওই আবেদনের পর তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এ বছরের ১ জুন গেজেট প্রকাশ করা হয়। আইনানুযায়ী গেজেট প্রকাশ হওয়ার দুই মাসের মধ্যে দেশে বা বিদেশ থেকে এ বিষয়ে আপত্তি জানাতে হয়; কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আপত্তি জানায়নি। তাই পণ্যটি এখন বাংলাদেশের স্বত্ব।

ইলিশ বাংলাদেশের সম্পদ, আমাদের জাতীয় মাছ। এই ইলিশ আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে। বিষয়টি মাথায় রেখে ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য হিসেবে পেতে আবেদন করা হয়।

এর ফলে অন্যান্য আরো পণ্য 'ভৌগোলিক নির্দেশক' পণ্য হিসেব স্বীকৃতি পাওয়ার পথ সুগম হলো। ইলিশ 'ভৌগোলিক নির্দেশক' পণ্যের স্বীকৃতি পাওয়ায় মাছটি দেশীয় ব্র্যান্ড হিসেবে বিদেশে যাবে। এতে ক্রেতারা সঠিক পণ্য শনাক্ত করতে পারবেন। দেশের অর্থনীতিতেও বিষয়টি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

ওয়ার্ল্ড ফিশের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতিবছর যে পরিমাণ ইলিশ আহরণ করা হয়, তার ৬৫ শতাংশের জোগান দেয় বাংলাদেশ। ভারতে ১৫ শতাংশ, মিয়ানমারে ১০ শতাংশ, আরব সাগর তীরবর্তী দেশগুলো এবং প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগর তীরবর্তী দেশগুলোতে বাকি ইলিশ ধরা পড়ে। আর বাংলাদেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান প্রায় ১০ শতাংশ। বাংলাদেশে বছরে পৌনে চার লাখ টনের মতো ইলিশ আহরণ হয়, যার বাজারমূল্য ১৫ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা। ইলিশ আছে, বিশ্বের এমন ১১টি দেশের মধ্যে ১০টিতেই ইলিশের উৎপাদন কমছে। একমাত্র বাংলাদেশেই ইলিশের উৎপাদন বাড়ছে। ■

তথ্যসূত্র

১. দৈনিক আমাদের সময়, ২৫ আগস্ট ২০১৭
২. দৈনিক প্রথম আলো, ৭ আগস্ট ২০১৭, অনলাইন সংস্করণ

ফেসবুকে ধর্ম অবমাননা রংপুরে হিন্দুদের বাড়িতে আগুন

হাসিবুর রহমান

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে হজরত মুহম্মদ (সা.)-কে কটূক্তি করে পোস্ট দেয়ায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে গত ১০ নভেম্বর, শুক্রবার বিকেলে রংপুর সদর এবং গঙ্গাচড়া উপজেলার ঠাকুরপাড়া গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ১৪টি ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং আটটি ঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। হামলাকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত এবং সাত পুলিশ সদস্যসহ ২৫ জন আহত হয়। এর আগে, গত ৬ নভেম্বর জনৈক রাজু মিয়া খলেয়া ইউনিয়নের হরকলি ঠাকুরপাড়ার টিটু রায়ের (৪০) বিরুদ্ধে গঙ্গাচড়া মডেল থানায় তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগ করেন। মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, গত ২৮ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ MD Titu (অভিযুক্ত টিটু রায়) নামের ফেসবুক আইডি থেকে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহম্মদ (সা.)-কে কটূক্তি করে একটা লেখা পোস্ট করার পর ঘটনার সূত্রপাত হয়। যাতে মুহম্মদ (সা.)-কে অপমান ও মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধানে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) প্রতিনিধি গত ১৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান, আগুনে ভস্মীভূত ঘরগুলোর স্থলে উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় টিনের ছাপরা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন নির্মিত ঘরের সামনে কথা হয় হামলাকারীদের দেয়া আগুনে তিনটি ঘর ভস্মীভূত হওয়া সুধীর চন্দ্র রায়ের (৬৫) সঙ্গে। তিনি বলেন, 'শুক্রবারের (১০ নভেম্বর) হামলার ঘটনার কয়েক দিন আগে থেকেই পার্শ্ববর্তী হরকলি ঠাকুরপাড়ার টিটু রায় মুসলিম ধর্মকে অপমান করছে বলে শোনা যাচ্ছিল। এলাকার মুসলমানরা টিটুর বাড়ি ঘেরাও করবে এমন আলোচনাও ছিল। টিটু রায় এ ধরনের কাজ করে থাকলে আমরাও তার বিচার চাই। কিন্তু মুসল্লিরা নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর স্লোগান দিয়ে নিরপরাধ হিন্দুদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে, লুটপাট করেছে। টিটুর নামে গঙ্গাচড়া থানায় মামলাও হয়েছিল, তবে টিটু ৫-৭ বছর ধরে এলাকায়ই থাকে না। এলাকার মুসলমানরা গত মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) পাগলাপীরে মানববন্ধন করে। এই শুক্রবার নামাজের পরও টিটুকে গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন হবে বলে তারা ঘোষণা দেয়। মানববন্ধন উপলক্ষ্যে দুই দিন ধরে মমিনপুর, বালাপাড়া, হাড়িয়ালকুটি, ইকুরাচালিতে মাইকিং করা হয়েছে, শুনেছি লিফলেটও বিলি করা হয়েছিল। হামলা হতে পারে, এমন খবরে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই আতঙ্ক বিরাজ করছিল। ঠাকুরপাড়ার রাস্তায় শুক্রবার সকাল ১১টার দিক থেকে পুলিশ ছিল। নামাজের পর মুসলিমরা টিটুর বাড়ি ঘেরাও করবে শুনে দুপুরের পরপরই এ পাড়ার মেয়েরা পাশের বড়ন্তর গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বাড়ির যুবক পুরুষেরাও ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তবে মনে একটা সাহস ছিল টিটু রায়ের বাড়িতে গেলেও এদিকে মানুষ আসবে না। কিন্তু ৩টার দিকে শলেয়া শাহবাজারের আশপাশের এলাকা থেকে আসা হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে ঠাকুরপাড়ার দিকে আসতে থাকে। সাড়ে ৩টার দিকে পেট্রোল ঢেলে ঘরে আগুন দেয়। তাদের দেয়া আগুনে বসতঘর, গোয়ালঘর ও রান্নাঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। উঠোনের আম-কাঁঠালের গাছও পুড়ে গেছে। একই সঙ্গে ক্ষীরোধ রায়, অমূল্য চন্দ্র রায়, সেতু রায় এবং পুলিন চন্দ্র রায়ের বাড়িতেও আগুন দেয় হামলাকারীরা। আগুন নেভাতে গেলে আক্রমণকারীরা ষাটোর্ধ্ব সুধীর ও তাঁর ভাই পুলীন চন্দ্র রায়কে মারধর করে এবং আগুন নেভালে তাঁদের মেরে ফেলার হুমকি দেয়। হামলাকারীর ঘরের গুরুত্বপূর্ণ মালামাল লুট করা পাশাপাশি নলকূপ এবং পাঁচ-সাতটি গরুও নিয়ে যায়।' সুধীর রায় আরো বলেন, 'লাঠিসোঁটার সঙ্গে হামলাকারীরা ছোরা-চাকু ও বোতলে করে পেট্রোল নিয়ে এসেছিল। তারা হামলার সময় বাড়ির নারীদের খোঁজ করতে থাকে। কিন্তু নারী-শিশুরা আগেই পালিয়ে যাওয়ার নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পায়। বর্তমানে

টিটু রায়ের পরিবারের কয়েকজন

পুলিশ পাহারা দিচ্ছে কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে?' প্রশ্ন রেখে সুধীর রায় বলেন, 'পুলিশ চলে গেলে যদি আবার হামলা হয়, তাহলে ঠেকাবে কে? সরকার ঘর তুলে দিয়েছে, নগদ টাকাও দিয়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে ভয় ঢুকে গিয়েছে। কোনোভাবেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি না।'

এদিকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে গ্রেফতার টিটু রায়ের মা সত্তরোর্ধ্ব জীতুন বালা বলেন, 'টিটু কয়েকটি এনজিও এবং মানুষের কাছ থেকে ৫-৬ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিল। ব্যবসা করতে গিয়ে টাকাগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পাঁচ-সাত বছর আগে এলাকা ছেড়ে চলে যায়। নারায়ণগঞ্জ থাকত। এনজিওর ঋণের টাকা শোধও করেছিল। মানুষের টাকা এখনো সব শোধ করতে পারেনি। বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়ার আগে খবর পেয়েছিলাম এলাকার মুসলমানেরা বাড়ি ঘেরাও করবে, টিটু নাকি মুসলিম ধর্মকে অপমান করেছে। কিন্তু টিটু তো লেখাপড়া জানে না, ছোটবেলায় ব্র্যাকের স্কুলে গিয়েছে শুধু নিজের নাম-ঠিকানা লিখতে পারে। তার পরও আমার ছেলে যদি কোনো অন্যায় করে থাকে, তার বিচার হোক। কিন্তু নিরপরাধ হিন্দুদের বাড়িতে আগুন দেয়ার, লুটপাট করার কী অর্থ? শুনেছি টিটুকে পুলিশ ধরেছে, পুলিশে যেহেতু ধরেছে এখন জানা যাবে সে এসব করেছে নাকি অন্যরা ষড়যন্ত্র করেছে।'

তিনি আরো বলেন, 'শুনেছি হাজার হাজার লোক মিছিল নিয়ে এসে হামলা চালায়। জীবন বাঁচাতে হামলার আগেই বাড়ি ছেড়ে প্রতিবেশীদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বাড়িতে থাকলে ওরা হয়তো আমাকেই মেরে ফেলত। তারা সাড়ে ৩টার দিকে ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের তামাকের গোডাউনে ভাঙচুর চালিয়ে ছোট ছেলে বিপুলের বসতঘর ও গোয়ালঘরে আগুন দেয়। আমার রান্নঘরে আগুন দেয় এবং বসতঘর ভাঙচুর করে। ঘরের জিনিসপত্রও নিয়ে যায়।' তবে ছেলে গ্রেফতার হওয়ার খবর শুনলেও ভয়ে থানায় গিয়ে দেখা করেননি। টিটু রায়ের পক্ষে কোনো আইনজীবী নিয়োগ দেননি বলেও আসক প্রতিনিধিকে জানান জীতুন বালা।

হরকলি ঠাকুরপাড়ার বাসিন্দা ও হরকলি কচুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুজনচন্দ্র রায়। তাঁকে হামলাকারীরা বাড়ির পাশ থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং মারধর করে। সুজনচন্দ্র রায় আসক প্রতিনিধিকে জানান, স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার (৯ নভেম্বর) বিকেলে থানায় গিয়ে ঠাকুরপাড়ায় হামলা হতে পারে, এমন আশঙ্কার বিষয়টি জানায়, তখন থানা থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া হয়েছিল।

তিনি বলেন, "শুক্রবার (১০ নভেম্বর) সাড়ে ৩টার দিকে টিটু রায়ের বিচারের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগানের পাশাপাশি 'ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান, হিন্দুরা হুঁশিয়ার সাবধান' স্লোগান দিতে দিতে শলেয়া শাহ বাজার থেকে ঠাকুরপাড়ায় এসে উপস্থিত হয় এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তখন আতঙ্কে বাড়ি থেকে বের হয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে পাশের বড়ন্তর গ্রামের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করি এবং দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ির অন্যদেরও বের হয়ে আসার জন্য ফোন করি। হামলাকারীদের কয়েকজন মাঠের মধ্যে ফোন করা অবস্থায় দেখতে পেয়ে, 'পুলিশে খবর দিচ্ছে একে ধর ধর' বলে চিৎকার করে এগিয়ে আসে এবং ধরে ফেলে। এ সময়

টিটু রায়ের মা জীতুন বালা

আমার মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে এবং টানতে টানতে ক্যানেলের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। ক্যানেলের পাশে রাস্তায় ওঠার পর দুই সাবেক ছাত্র আমাকে দেখতে পেয়ে হামলাকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে বড়ন্তর গ্রামে নিয়ে যায়।"

সুজন রায় আরো বলেন, 'কোনো ধর্ম বা ধর্মের মহান পুরুষকে নিয়ে কটূক্তি এই এলাকার শান্তিপ্রিয় হিন্দু সম্প্রদায় কখনোই সমর্থন করে না। এখানকার হিন্দু-মুসলিমরা দীর্ঘদিন যাবৎ মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। একজন মুসলিমও পুলিশের গুলিতে মারা গেল, আবার কতজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। এলাকায় যে অশান্তি শুরু হলো তা কি আর কোনোদিন ঠিক হবে? এলাকার হিন্দু-মুসলমানেরা কি আর একসঙ্গে মিলতে পারবে?'

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

রংপুর সদর ও গঙ্গাচড়া উপজেলায় অবস্থিত হরকলি ঠাকুরপাড়ায় ঘটনার পর থেকেই ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় বলে ১৫ নভেম্বর আসক প্রতিনিধিকে জানান জেলা প্রশাসক ওয়াহিদুজ্জামান। এ বিষয়ে রংপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান আসক প্রতিনিধিকে জানান, ক্ষতিগ্রস্ত ১১টি ঘর পুনর্নির্মাণ ও তিনটি মন্দির সংস্কার করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৮ হাজার টাকা করে ক্ষতিগ্রস্ত ১১টি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে শুকনা খাবার, ৪০টি কম্বল এবং প্রয়োজনমাফিক হাঁড়ি-পাতিল, শাড়ি-লুঙ্গি সরবরাহ করা হয়। নিরাপদ পানি এবং পয়োব্যবস্থায় যেন ব্যাঘাত না ঘটে সে লক্ষ্যে শীঘ্রই তিনটি নলকূপ বসানো হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পায়খানার রিং ও স্লাব দেয়া হবে।

গৃহীত আইনি পদক্ষেপ ও পুলিশের বক্তব্য

গত ১৫ নভেম্বর রংপুর পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ বি এম জাকির হোসাইন আসক প্রতিনিধিকে জানান, শুক্রবারের এই হামলার আগে ৬ নভেম্বর রাতে লালচাঁদপুর গ্রামের রাজু মিয়া নামে এক ব্যক্তি টিটু রায়কে একমাত্র আসামি করে গঙ্গাচড়া থানায় ৫৭ ধারায় ধর্ম অবমাননার একটা অভিযোগ

দায়ের করে। পরদিন মঙ্গলবার তারা পাগলাপীর বাজারে মানববন্ধন করে। পুলিশের সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের শান্ত থাকার অনুরোধ জানায়। পরে আবারও তারা শুক্রবার মানবন্ধনের ডাক দেয়, শুক্রবার জুমার নামাজে পাগলাপীর মসজিদে পুলিশের উর্ধ্বতনেরা নামাজ আদায় করেন এবং পুলিশ তদন্ত করছে জানিয়ে স্থানীয় মুসল্লিদের শান্ত থাকার পরামর্শ দেন। নামাজের পর তারা মানবন্ধন করে ফিরেও যায়। কিন্তু শলেয়া শাহ বাজারে এক সাবেক চেয়ারম্যানের জানাজা থেকে পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করে। সেখানে জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির নেতৃবৃন্দ উসকানিমূলক বক্তব্য দেন। তাঁদের বক্তব্যের পর জানাজায় উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ উত্তেজিত হয়ে ঠাকুরপাড়ার দিকে রওনা হয়। জামায়াতের লোকজন 'তৌহিদী জনতা' লেখা একটি ব্যানার নিয়ে মিছিলের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দেয়। পুলিশ তাদের সেখানে আটকানোর চেষ্টা করে, তারা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে ঠাকুরপাড়ার দিকে চলে আসে। টিটু রায়ের বাড়িতে নিরাপত্তার স্বার্থে আগে থেকেই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল, কিন্তু ঠাকুরপাড়ায় এসে তারা টিটুদের বসতবাড়ির পাশে একটি তামাকের গুদামে ভাঙচুর চালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ এলাকাবাসীর জানমাল রক্ষার্থে তাদের বাধা দিলে তারা পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশ সাধারণ হিন্দুদের রক্ষার্থে কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, একপর্যায়ে পুলিশ শটগানের গুলি ছুড়ে হামলাকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তখন কিছু হামলাকারী পালানোর সময় রাস্তার ওপারে ঠাকুরপাড়ার হিন্দুদের বেশ কয়েকটি ঘরে আগুন দেয় এবং লুটপাট চালিয়ে পালিয়ে যায়। আর পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত শলেয়া শাহ গ্রামের একরামুল হকের ছেলে হাবিবুর রহমান রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। তাদের হামলায় পুলিশের সাত সদস্যও আহত হন। তিনি আরো জানান, এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ১০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে রংপুর সদর ও গঙ্গাচড়া থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেছে। রংপুর সদর থানায় দায়েরকৃত মামলা নম্বর-২৯ এবং গঙ্গাচড়া থানার মামলা নম্বর ১১। এই দুই মামলায় দেড় শতাধিক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে ১৪ নভেম্বর নীলফামারী থেকে আটক হওয়া টিটু রায়কে ১৫ নভেম্বর আদালতে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চাইলে আদালত চার দিন জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেয়। এ ছাড়াও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন– অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল এ) সাইফুল ইসলাম এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান।■

তথ্যসূত্র

১. প্রথম আলো, ১১.১১.২০১৭
২. প্রথম আলো, ২২.১১.২০১৭
৩. bangla.bdnews24.com 10.11.2017
৪. channelionline.com 17.11.2017
৫. সরেজমিন তথ্যসংগ্রহ, আসক

রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমঝোতা স্মারক

সুবর্না ধর

১৬ নভেম্বর, ২০১৭ বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকার 'রাখাইন রাজ্য থেকে বাস্তুচ্যুত লোকজনের ফিরে যাওয়ার' বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। মিয়ানমারের রাজধানী নেপিডোয় স্বাক্ষরিত এই দলিলের শিরোনামে সেটিকে দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে গত ২৫ আগস্ট ২০১৭ থেকে শুরু হওয়া সামরিক, অসামরিক তথা মিয়ানমার রাষ্ট্রের পরিকল্পিত হামলায় প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসা ৬ লাখের বেশি রোহিঙ্গাসহ এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নেয়ার কার্যক্রম শুরু করার কথা বলা হচ্ছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য অনুসারে, তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি 'জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ' গঠন করে দুই মাসের মধ্যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু করা হবে। অবশ্য, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর এখনো পর্যন্ত তা নিয়ে বাংলাদেশ বা মিয়ানমার কোনো পক্ষই বিস্তারিত কোনো আলোচনা উপস্থাপন করেনি। তবে গণমাধ্যমে প্রকাশিত দুই দেশের প্রতিনিধিদের বক্তব্য অনুসারে বলা যায়, এই চুক্তি ১৯৯২ সালের চুক্তির নামান্তর মাত্র। ১৯৯২ সালের চুক্তি অনুযায়ী মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের একটি বড় অংশকেই ফেরত নেয়নি। সেই সঙ্গে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্যাতিত, নিজভূমি ছেড়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মতামতকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। অধিকারবঞ্চিত এসব মানুষ যেসব কারণে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, সেসবের কোনো পরিবর্তন ছাড়াই এই ফিরিয়ে দেয়ার এবং নেয়ার ক্ষেত্রে বরাবর রাষ্ট্রদ্বয়ের ইচ্ছাই প্রাধান্য পেয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর ১৯৯৬ সালের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়– যেসব রোহিঙ্গা সুরক্ষাহীনতা ও নিরাপত্তার সংশয়ে মিয়ানমারে ফিরে যেতে রাজি ছিল না, তারাও ফিরে যেতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, ফিরে যাওয়া রোহিঙ্গাদের নিজেদের বাসস্থানে ফিরিয়ে নেয়ার পরিবর্তে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে ক্যাম্পে 'ইন্টারনালি ডিসপ্লেসড পার্সন' হিসেবে রাখা হয়। ক্যাম্পে তাদের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকারসহ সব ধরনের অধিকার আরো সংকুচিত করা হয়। যদিও জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনারকে (ইউএনএইচসিআর) তৎকালীন চুক্তিতে সম্পৃক্ত করা হয়নি তবুও সংস্থাটি রোহিঙ্গাদের ফিরে যাওয়া এবং মিয়ানমারে তাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ইউএনএইচসিআর দুই দেশের

প্রতি রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক ফেরত না পাঠানোর এবং ফিরে যাওয়া ব্যক্তিদের মানবাধিকার সুরক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৩ সালে ইউএনএইচসিআর-এর দাবিগুলো বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সংগঠনটির সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর পরও তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) কর্তৃক বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গাকে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানোর খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে নির্যাতন বন্ধে মিয়ানমারের প্রতি বারবার দাবি জানানো হলেও রাখাইন রাজ্যে জাতিগত নিধন অব্যাহত থাকে। ২০১২ সালের জুন মাসে রোহিঙ্গা মুসলিম ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দাঙ্গার ফলে লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয় এবং প্রায় ৯০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ২০১৬ সালে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর হামলার শিকার হয়ে প্রায় ৬৯ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

এই অতীত বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়েই বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ফিরে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, এমনটাই ধারণা করা হচ্ছিল। ধারণা করা হচ্ছিল, সাময়িক সিদ্ধান্তহীনতা কাটিয়ে উঠে বাংলাদেশ সরকার প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বড় মনের পরিচয় দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছ থেকে যে প্রশংসা অর্জন করেছে, তার ধারাবাহিকতায় রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও মর্যাদার সঙ্গে নিজ দেশে ফেরা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কিন্তু, চলতি বছরের নভেম্বরে স্বাক্ষরিত দ্বিপক্ষীয় এই সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নের ফলে একটি জাতিগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্র বন্ধ হবে, নাকি তা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। সমঝোতা স্মারকটি মূলত 'রাখাইন রাজ্য থেকে বাস্তুচ্যুত লোকজনের ফিরে যাওয়ার' ব্যবস্থাপত্র হিসেবেই উল্লেখ করা হয়। সেখানে রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর জাতিগত পরিচয়, গত আগস্ট ২০১৭ থেকে শুরু হওয়া নির্যাতন যা জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন 'জাতিগত নির্মূল' বলে ঘোষণা করা এবং অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের হোলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড ফরটি রাইটস এর প্রতিবেদনে যে সহিংসতাকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে 'গণহত্যা' বলা, তার কোনো উল্লেখ নেই।

কিন্তু মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রাখাইনে কথিত আরাকান স্যালেভশন আর্মির (আরসা) কথিত সন্ত্রাসীদের দমনের নামে যে নৃশংস অভিযান শুরু করে, এর ফলে বাংলাদেশে আশ্রয়প্রত্যাশী জনস্রোত অব্যাহত থাকায় সংকট সমাধানে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে প্রথম থেকেই। সংকট উত্তরণে ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পাঁচ দফার একটি প্রস্তাবও তুলে ধরেন। প্রস্তাবটিতে অনতিবিলম্বে মিয়ানমারে সহিংসতা বন্ধ করা, জাতিসংঘের নিজস্ব তথ্যানুসন্ধান পাঠানো, রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করাসহ কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার নিঃশর্ত ও দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার বিষয়গুলো প্রধান্য পায়। অথচ রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমঝোতা স্মারকটি সাধারণ বিবেচনায় মনে হয় বাংলাদেশ মূলত মিয়ানমার সরকারের সকল শর্ত মেনে নিয়েই এই সমঝোতায় পৌঁছেছে। এবং এর মাধ্যমে গত আগস্ট ২০১৭ থেকে রোহিঙ্গা জনস্রোত ও মিয়ানমার সরকারের আগ্রাসী ভূমিকার বিপক্ষে বাংলাদেশের যে অবস্থান ছিল এবং বর্তমানে যে অবস্থান, তা বিশ্ববাসীর কাছে স্ববিরোধিতার বার্তা পৌঁছে দিতে পারে। সমঝোতা স্মারকের যে বিষয়গুলো দুই দেশের প্রতিনিধিদের বক্তব্যে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেই চুক্তিতে রোহিঙ্গাদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি বরাবরের মতো গুরুত্বহীনই থেকে গেছে।

প্রথমত, সমঝোতা স্মারকে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার উল্লেখ না করলেও শর্ত জুড়ে দেয় যে, তারা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রাখাইন রাজ্যের লোকজনের সে দেশে অবস্থানের দালিলিক প্রমাণ যাচাই বাছাই করে পরিচয়পত্র প্রদান করে তারপর প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সিএনএন-এর একটি প্রতিবেদনে ইউরোপে থাকা একজন রোহিঙ্গা অধিকারকর্মী Nay San Lwin এর উল্লেখ করে বলা হয়, 'গত আগস্ট ২০১৭-এর কথিত সন্ত্রাস দমনের অভিযানের আগেই অধিকাংশ রোহিঙ্গার রাখাইন রাজ্যে বসবাসের প্রমাণ দলিলগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়।' এ ছাড়াও কথিত সন্ত্রাস দমনে নির্বিচারে, অতর্কিত সাধারণ রোহিঙ্গা জনগণের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়, যার

ফলে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা অধিকাংশ মানুষেরই সে দেশে অবস্থানের কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, মিয়ানমারের পুনর্বাসন ও কল্যাণ মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, চুক্তি অনুসারে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় দিনে সর্বোচ্চ মাত্র ৩০০ রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। এই হারে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় সকল রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নিতে প্রায় ২ দশকেরও বেশি সময় লাগবে বলে ধারণা করছেন রোহিঙ্গা অধিকারকর্মীরা। চুক্তির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোটাই যদি মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে, অন্তত এই লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশের সফলতা প্রায় অনিশ্চিতই বলা যেতে পারে। তৃতীয়ত, চুক্তি অনুযায়ী ফিরে যাওয়া রোহিঙ্গাদের অস্থায়ী ক্যাম্পে রাখা হবে। তবে মিয়ানমার সরকার তাদের যাতে দীর্ঘ সময় ক্যাম্পে অবস্থান করতে না হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু বিগত সময়ে ১৯৯২ সালের চুক্তি অনুযায়ী ফিরে যাওয়া রোহিঙ্গারা দশকের পর দশক অস্থায়ী ক্যাম্পেই বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে এবং ২৫ আগস্ট পরবর্তী হামলার কারণে সেই অস্থায়ী বাসস্থানও হারিয়ে আবার শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয়ের আশায় ছুটে এসেছে। এ ছাড়া এবারের চুক্তি বাস্তবায়নেও ইউএনএইচসিআর বা তৃতীয় কোনো পক্ষের উপস্থিতির সুযোগ না রাখার কারণে সেখানে তাদের মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন কতটা নিশ্চিত করা যাবে তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও কর্মীরা। চতুর্থত, এই সমঝোতা স্মারকে উল্লেখ করা হয়, ফিরে যাওয়া রোহিঙ্গারা রাখাইনে চলাফেরার স্বাধীনতাসহ অন্য সব অধিকার ভোগ করবে রাজ্যের বর্তমান আইন অনুযায়ী। রাখাইনের বর্তমান আইন রোহিঙ্গাদের কতটুকু স্বাধীনতা দেয় তা নির্দেশ করার জন্য সাম্প্রতিক অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের একটি প্রতিবেদনে রাখাইন অঞ্চলের রোহিঙ্গা অধিবাসীদের 'ছাদবিহীন খাঁচায় বন্দি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে রাখাইনবাসী রোহিঙ্গাদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়– সেখানে তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা এসব অধিকার থেকে যেমন বঞ্চিত, তেমন চলাফেরার স্বাধীনতাসহ অন্য প্রায় সব নাগরিক অধিকারও ভোগ করতে পারে না। এ ছাড়াও বন্দিত্বের অনুভূতি নিয়ে বেঁচে থাকা এবং 'জাতিগত বিনাশ' ও 'গণহত্যার' মতো চরম মানবিক বিপর্যয়ের সাক্ষী হয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশের আশ্রয় নেয়া এসব মানুষের ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে বিবেচনায় নেয়ার সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ এই চুক্তিতে নেই। সেই সঙ্গে ফিরে যাওয়া রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব, নিরাপত্তা তথা মানবাধিকার রক্ষায় মিয়ানমার সরকার কী ভূমিকা গ্রহণ করবে তারও কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। একই সঙ্গে, রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি ঠিক কতটা প্রত্যাবর্তন উপযোগী সেই বিষয়টিও বিবেচনায় নেয়া হয়নি। নভেম্বর, ২০১৭-তে প্রকাশিত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের একটি প্রতিবেদনে ('Caged without a roof: Apartheid in Myanmar's rakhine State') উল্লেখ করা হয়, 'রাখাইন রাজ্যের সাম্প্রতিক সহিংসতা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি জাতিগত বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ। আর এই বিদ্বেষের ফলে একটি জাতিগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দমন-পীড়নের শিকার হয়, যা রাষ্ট্রীয় আইন, নীতিচর্চাতেই বিদ্যমান।' গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের ভাষ্য মতে, রাখাইন রাজ্যের গ্রামের ৩৬টি নৃগোষ্ঠী সুস্পষ্টভাবেই রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করে আসছে। এই সময়েই রোহিঙ্গাদের ফিরে পাঠানোর বা নেয়ার এই চুক্তি কতটা সময়োপযোগী তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন সংগঠন ও মানবাধিকার কর্মীরা।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পরদিন রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের জন্য এখনই সঠিক সময় নয় বলে মন্তব্য করে জাতিসংঘ। অন্যদিকে, এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর বলেছে 'এ মুহূর্তে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি রোহিঙ্গাদের ফেরার এবং বসবাসের জন্য নিরাপদ নয়। এখনো অনেক মানুষ পালাচ্ছে। বহু মানুষ সহিংসতা আর ধর্ষণের শিকার হয়ে মারাত্মক মানসিক আঘাতের মধ্যে পড়েছে। অনেকে নিজের চোখের সামনে বন্ধু-স্বজনদের খুন হতে দেখেছে। বেশিরভাগই তাদের সহায়-সম্বল হারিয়েছে, তাদের ঘরবাড়ি, গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।' চুক্তি স্বাক্ষরের পরেও রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ আসা অব্যাহত থাকা মূলত এসব মন্তব্যের যথার্থতাকেই নির্দেশ করে। এইখানে উল্লেখ, কক্সবাজারে মানবিক সহায়তার কাজে যুক্ত সংস্থাগুলোর জোট ইন্টার সেক্টর কো-অরডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি)'র তথ্য অনুযায়ী ১৬ নভেম্বর বাংলাদেশে আশ্রয়

নেয়াদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেয়ার চুক্তি হওয়ার পরবর্তী সপ্তাহেই প্রায় ২ হাজার নতুন রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসে।

সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, বিগত কয়েক দশক ধরে মিয়ানমার রাষ্ট্র একটি জাতিসত্তাকে নিশ্চিহ্ন করার যে ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে, তার ফলে বাংলাদেশও সংকটে পড়েছে বারবার। এবারকার শরণার্থী সংকটের ভয়াবহতায় সংকট সমাধানে বাংলাদেশের আরো কৌশলী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বর্তমান এই চুক্তির বিষয়ে দেশি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে তা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সংকট উত্তরণের কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার ওপর নির্ভর করছে রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ। ■

তথ্যসূত্র

১. http://www.aljazeera.com/news/2017/11/rohingya-consulted-repatriation-groups-171125094810411.html
২. http://www.aljazeera.com/news/2017/11/amnesty-rohingya - rakhine-state-live-apartheid-171121103020244.html
৩. http://www.burmalibrary.org/docs/Abrar-repatriation.htm
৪. http://citeseerx.ist. psu.edu/ viewdoc/ download? doi= 10. 1. 1. 1000.1419&rep=rep1&type=pdf
৫. https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-humanitarian-situation-report-no12-rohingya-influx-26-november-2017
৬. https://www.hrw.org/news/2017/02/08/bangladesh-reject-rohingya-refugee-relocation-plan

প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার পদত্যাগ

মাবরুক মোহাম্মদ

অবশেষে পদত্যাগ করলেন বাংলাদেশের ২১তম প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। অনেক আলোচনার জন্ম দেয়া সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে আপিল বিভাগের রায় প্রকাশিত হবার পর বিতর্ক চলমান থাকা অবস্থায় তিনি পদত্যাগ করেছেন। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞাকে নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। অবশ্য বিচারপতি সিনহার পদত্যাগের মধ্য দিয়ে বিতর্কের অবসান হয়ে যায়নি। এখন সামনে এসেছে নতুন কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা– নতুন প্রধান বিচারপতি কে হবেন, কবে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হবে, হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগে নতুন বিচারপতি নিয়োগ দেয়া হলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তাদের শপথ পড়াতে পারবেন কি না এবং ষোড়শ সংশোধনীর রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের রিভিউ পিটিশন।

বিচারপতি সিনহার পদত্যাগের ঘটনাপ্রবাহ

সুপ্রিম কোর্টের অবকাশ শুরুর আগে গত ২৪ আগস্ট শেষ অফিস করেন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা। অবকাশের মধ্যেই গত ১০ সেপ্টেম্বর তিনি দুই সপ্তাহের জন্য বিদেশ সফরে গেলে তার অবর্তমানে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারক হিসেবে বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞাকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। সুপ্রিম কোর্টের অবকাশের শেষ দিন ছিল ২ আগস্ট ২০১৭। সেদিনই প্রধান বিচারপতির আরো এক মাসের ছুটিতে যাওয়ার খবর দেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার ছুটিতে যাওয়া নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে অবশেষে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তাঁর ছুটির আবেদনটি প্রকাশ করেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। চাপের মুখে প্রধান বিচারপতিকে ছুটি নিতে বাধ্য করা হয়েছে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলার পর ৪ অক্টোবর আইনমন্ত্রী প্রধান বিচারপতি সিনহার আবেদনটি প্রকাশ করেন।

সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে আনিসুল হক রাষ্ট্রপতিকে লেখা প্রধান বিচারপতির ওই চিঠিটি প্রথমে পড়ে শোনান। পরে টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে ওই চিঠি তিনি তুলে ধরেন এবং গণমাধ্যম কর্মীদের চিঠির ছবি তোলার অনুমতি দেন। পরে আইন সচিব আবু সালেহ শেখ মো. জহিরুল হকের হাত থেকে সাংবাদিকরা প্রধান বিচারপতির ছুটির আবেদনের ছবি তুলে নেন। রাষ্ট্রপতি বরাবর প্রধান বিচারপতির লেখা চিঠির 'বিষয়' লেখা হয়েছে– 'অসুস্থতাজনিত কারণে ৩ অক্টোবর ২০১৭ খ্রি. হতে ১ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৩০ দিনের ছুটির আবেদন। ছুটির আবেদনে দেখা যায় বিচারপতি এস কে সিনহা ক্যানসার ও শারীরিক জটিলতার কারণে ছুটির আবেদন করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বিদেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার কথাও উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে দেখা যায় রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সিনহাকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুর করেছেন এবং এই সময়ে অথবা প্রধান বিচারপতি

দায়িত্বে না ফেরা পর্যন্ত বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞাকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেছেন। এই বিষয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, প্রধান বিচারপতি যা চেয়েছেন, তা-ই হয়েছে। তিনি আরো বেশি সময় বিদেশ থাকবেন তাই ছুটি বাড়ানো হয়েছে। এ সময় বিএনপি অভিযোগ করে যে, চাপ দিয়ে প্রধান বিচারপতিকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে।

১৩ অক্টোবর বিচারপতি সিনহা বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে জানান যে, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। বিচার বিভাগ যাতে 'কলুষিত' না হয় সেজন্য তিনি 'সাময়িকভাবে' দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন বলে সাংবাদিকদের জানান। তিনি আরো বলেন, আমার কারো প্রতি কোনো বিরাগ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সরকারকে ভুল বোঝানো হয়েছে। এরপর সাবেক প্রধান বিচারপতি তাঁর একটি লিখিত বিবৃতির কপি সাংবাদিকদের দেন। সেই বিবৃতিতে ষোড়শ সংশোধনী রায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ইদানীং একটা রায় নিয়ে রাজনৈতিক মহল, আইনজীবী ও বিশেষভাবে সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যেভাবে সমালোচনা করেছেন, এতে আমি সত্যিই বিব্রত। সরকারের একটি মহল তাঁর রায়ের ভুল ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পরিবেশন করায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতি অভিমান করেছেন বলে মনে করেন বলে জানান বিচারপতি সিনহা এবং অচিরেই এটি দূর হবে বলে তাঁর বিশ্বাসের কথা বলেন। সাবেক প্রধান বিচারপতি তাঁর দেয়া লিখিত বিবৃতিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

বিচারপতি সিনহা দেশ ত্যাগের পরদিন ১৪ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট একটি বিবৃতিতে ছুটি নিয়ে বিচারপতি সিনহা বিদেশে যাওয়ার আগে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাকে 'বিভ্রান্তিমূলক' আখ্যায়িত করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিবৃতিতে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ গত ৩০ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের বিচারপতিদের ডেকে নিয়ে বিচারপতি সিনহার বিরুদ্ধে '১১টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ' তুলে ধরেন। এর মধ্যে বিদেশে অর্থ পাচার, আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি, নৈতিক স্খলনসহ আরো সুনির্দিষ্ট গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। ওই বৈঠকে বিচারপতি ইমান আলী ছাড়া আপিল বিভাগের অন্য চার বিচারক বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞা, বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী ও বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দার ছিলেন। বিচারপতি ইমান আলী সেদিন ঢাকায় ছিলেন না। বঙ্গভবনের বৈঠক থেকে ফিরে পরদিন আপিল বিভাগের বিচারপতিরা নিজেরা বৈঠক করে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেন। বিবৃতিতে বলা হয়, সহকর্মীরা সিদ্ধান্ত নেন যে গুরুতর অভিযোগগুলো প্রধান বিচারপতিকে জানানো হবে। তিনি যদি সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তার সঙ্গে বিচারালয়ে বসে বিচারকাজ পরিচালনা সম্ভবপর হবে না। ওই দিনই পাঁচ বিচারপতি প্রধান বিচারপতির হেয়ার রোডের বাড়িতে যান। তাঁর সঙ্গে অভিযোগগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন তাঁরা। বিবৃতিতে বলা হয়, কিন্তু বিচারপতি সিনহার কাছ থেকে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও সদুত্তর না পেয়ে আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতি তাঁকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, এই অবস্থায় অভিযোগসমূহের সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে একই বেঞ্চে বসে তাঁদের পক্ষে বিচারকাজ পরিচালনা সম্ভবপর হবে না। এই পর্যায়ে মাননীয় প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, সে ক্ষেত্রে তিনি পদত্যাগ করবেন। তবে ২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে জানান। কিন্তু এরপর বিচারপতি সিনহা সহকর্মীদের কিছু না জানিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে এক মাসের ছুটিতে যাওয়ার কথা জানান বলে বিবৃতিতে বলা হয়।

এরপর অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেন, প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে ফেরা সুদূর পরাহত। কারণ তাঁর সহকর্মীরা তাঁর সঙ্গে এজলাসে না বসলে তিনি একা বিচারকাজ করতে পারবেন না। বিচারপতি সিনহা কানাডায় ছোট মেয়ের কাছে যাওয়ার পথে সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের দূতাবাসে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন। অবশেষে গত ১১ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বঙ্গভবন তাঁর পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারি বিচারপতি সিনহার নিয়মিত অবসরে যাবার কথা ছিল।

বিচারপতি সিনহার পদত্যাগের পর কে নতুন প্রধান বিচারপতি হবেন এবং কবে তাঁকে নিয়োগ দেয়া হবে সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এর মাঝেই আইনমন্ত্রী জানান, প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেয়া পুরোপুরি রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার। তিনি যখন চাইবেন তখনই নিয়োগ দেবেন। তিনি আরো জানান যে, ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতিদের শপথ পড়াতে পারবেন। তবে নতুন প্রধান বিচারপতি কে হচ্ছেন সেই বিষয়ে আইনমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে কিছু বলেননি। এরপর সরকার ষোড়শ সংশোধনীর রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা যায়।

রাজনীতি ও বিচার বিভাগ

বিচারপতি সিনহার পদত্যাগ পুরোপুরি আইন ও সংবিধানসম্মত হয়েছে কি না, তা নিয়ে একাডেমিক ও আইনজ্ঞরা হয়তো ভবিষ্যতেও গবেষণা করবেন। নিজস্ব অবস্থান থেকে সরে অথবা অবস্থানে থেকেই সীমা অতিক্রম করলে রাষ্ট্রে কী ধরনের অস্থিরতা তৈরি হতে পারে, এই ঘটনা সেটিই আমাদের দেখিয়ে দিল। ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়কে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের অঙ্গগুলো যে মুখোমুখি অবস্থানে চলে এসেছিল তা থেকে আপাতত রেহাই পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতেও রাষ্ট্রের অঙ্গগুলো একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়। একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, প্রধান বিচারপতি কেবল একটি পদ বা ব্যক্তি নন, এটি একটি প্রতিষ্ঠানও। এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদার সঙ্গে শুধু বিচার বিভাগই নয়, রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গের মর্যাদাও জড়িত। তাই এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষায় সরকার, বিচার বিভাগ, আইনজীবী ও রাজনীতিবিদসহ সংশ্লিষ্ট সবারই যত্নবান হওয়া দরকার। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি শক্তিশালী বিচার বিভাগ পেতে পারি বলে আশা করা যায়। ■

তথ্যসূত্র

১. প্রথম আলো, ২৪ আগস্ট ২০১৭
২. প্রথম আলো, ১১ নভেম্বর ২০১৭

ফিলিস্তিন সংকটের শত বছর, বেলফোর থেকে ট্রাম্পের ঘোষণা

মিজান মল্লিক

আরব ফিলিস্তিনিরা বেলফোর ঘোষণার খেসারত দিচ্ছে ১০০ বছর ধরে। এবার যোগ হয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের জেরুজালেম ঘোষণা। মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের পবিত্রতম এই শহরকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রেসিডেন্ট। এর মধ্য দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে চলা ফিলিস্তিন সংকট আবার তীব্র হলো। শুরু হলো আরো রক্ত ঝরানোর দিন।

জেরুজালেম শুধু ধর্মীয় কারণেই নয়, ঐতিহাসিক ও ভূরাজনৈতিক কারণেও অত্যন্ত স্পর্শকাতর শহর। ফিলিস্তিন ভেঙে একদিকে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল ও অন্যদিকে আরব ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের বিষয়ে ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে প্রস্তাব পাস করা হয়েছিল। যদিও ফিলিস্তিনিরা এই 'টু স্টেটস' প্রস্তাব মেনে নেয়নি। সে যা-ই হোক, ওই প্রস্তাবেও জেরুজালেম শহরটির জন্য স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা রাখা হয়।

কিন্তু ইসরায়েল ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় পূর্ব ও পশ্চিম জেরুজালেম দখল করে নেয়। পরে অধিকৃত এলাকা নিজ দেশের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কখনো মেনে নেয়নি। ইসরায়েল এসবের তোয়াক্কা না করে, স্রেফ গায়ের জোরে তা ভোগদখল করে আসছে। নতুন নতুন ইহুদি-বসতি স্থাপন করছে। পিএলও ও ইসরায়েলের ১৯৯৫ সালে সই করা অসলো শান্তিচুক্তিতে দুই পক্ষ একমত হয়েছিল যে, জেরুজালেমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ২০০০ সালে হোয়াইট হাউসের লনে ইসরায়েলি নেতা র‍্যাবিন ও ফিলিস্তিন নেতা ইয়াসির আরাফাত যে শান্তি কাঠামো চুক্তিতে সই করেন, তাতেও এই প্রশ্নে দুই পক্ষের একই মত ছিল।

ফিলিস্তিন সংকট সমাধানের অংশ হিসেবে জেরুজালেম কার– এই প্রশ্নে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন আলাপ-আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে, এই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নীতি। তা ৭০ বছর ধরে অনুসরণ করে এসেছে ওয়াশিংটন। কিন্তু ৬ ডিসেম্বর সেই নীতি ভ্রষ্ট হয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শহরটিকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। ইসরায়েলের বর্তমান রাজধানী তেলআবিব থেকে সেখানে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরেরও নির্দেশ দিয়েছেন।

তুরস্ক ও লেবাননসহ মুসলিম দেশগুলো তো বটেই, রাশিয়াসহ ইউরোপের অনেক দেশ হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, এ ধরনের স্বীকৃতি দিলে আবারও অশান্ত হবে ফিলিস্তিন। হয়েছেও তাই। ট্রাম্পের ঘোষণার পরপরই গাজায় ইসরায়েলি সীমান্তে বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়েছে। সেখানে ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে এক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। দুই দিন পর জুমার নামাজ শেষে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। সেদিন আরো দুজনের প্রাণ ঝরেছে। ওই দিন গাজার সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। জবাবে বিমান হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। কত দিন চলবে, আর কত ফিলিস্তিনির রক্ত ঝরবে, এখনই বলা মুশকিল।

এখন ফিরে দেখা যেতে পারে শত বছর আগের আরেকটি ঘোষণা ও এর পরিণতির দিকে। ২ নভেম্বর শত বছরপূর্তি হলো বেলফোর ঘোষণার। এই সেই ঘোষণা, যা স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর আর আরব ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্রহীন করার ভিত্তিমূল হিসেবে অনেকে বিবেচনা করেন।

ইহুদিরা প্রতিবছর দিনটি মহা ধুমধাম করে উদ্‌যাপন করে। ফিলিস্তিনি মুসলিমদের কাছে এটি ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন। বেলফোর ঘোষণা নিদারুণ এক শেল, যার আঘাতে তাদের বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। তারা বসতভিটা থেকে বিতাড়িত। দুই খণ্ড ভূমি এখনো ভোগদখলে আছে বটে, কিন্তু নেই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এ জন্য প্রতিবছর এই দিনে ফিলিস্তিনি আরব মুসলিমরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। স্লোগানে মুখরিত হয় পশ্চিমতীরের রামাল্লা ও গাজা উপত্যকা। ফিলিস্তিনিরা দাবি করে, বেলফোর ঘোষণার মধ্য দিয়ে তাদের ভূমি ইহুদিদের হাতে তুলে দিয়েছিল যুক্তরাজ্য। তাদের সঙ্গে যে সীমাহীন অবিচার করা হয়েছে, এজন্য যুক্তরাজ্য সরকারের লজ্জিত হওয়া উচিত, ক্ষমা চাওয়া দরকার।

বেলফোর ঘোষণা মূলত একটি চিঠি। মাত্র ৬৭ শব্দে লেখা কিছু প্রতিশ্রুতি। চিঠিটি ছোট্ট, কিন্তু এর অভিঘাত ভয়াবহ, শত বছরব্যাপী। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে 'ইহুদিদের জন্য একটি জাতীয় আবাস' প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর যুক্তরাজ্য এই প্রতিশ্রুতি দেয়। তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোরের সই করা চিঠিটি পাঠানো হয় যুক্তরাজ্যের ইহুদি নেতা লিওনেল ওয়াল্টার রথসচাইল্ডকে। চিঠিতে এ প্রতিশ্রুতিও ছিল যে, 'ফিলিস্তিনে ইহুদি নয়, এমন জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার খর্ব করে, এমন কিছু করা হবে না।' কিন্তু এই অংশটি উপেক্ষিত থেকে গেছে।

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড তখন ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ। সেখানে আরবরা ছিল প্রায় ৯০ শতাংশ। ইহুদিরা ছিল সংখ্যালঘু, মাত্র ৯ শতাংশ। তাদের কোনো দেশ ছিল না। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদিরা তখন নানাভাবে লাঞ্ছিত বঞ্চিত হচ্ছিল। এ থেকে নিস্তার লাভ করতে তারা আন্দোলন শুরু করে। ইহুদিরা একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখে। যে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের বিতাড়িত করা হয়েছিল, সেই ভূমিতেই তারা আবার ফিরে যেতে চায়। প্রতিষ্ঠা করতে চায় ইহুদি রাষ্ট্র। তবে কৌশলগত কারণে তারা রাষ্ট্রের পরিবর্তে বলে, তাদের এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, আন্তর্জাতিক আইন ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে তাদের জন্য একটি স্থায়ী আবাসস্থান প্রতিষ্ঠা করা। হাঙ্গেরীয় ইহুদি

শহর জেরুজালেম

নেতা থিওডর হারজেল দাবি করেন, ইহুদি সংকট রাজনৈতিক। তাই এর সমাধানও হতে হবে রাজনৈতিক উপায়ে। তিনি ১৮৯৬ সালে ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের ইশতেহার ঘোষণা করেন। পরের বছর নির্বাচিত হন বিশ্ব ইহুদিবাদী সংস্থার প্রেসিডেন্ট। কিন্তু স্বপ্ন পূরণের আগেই, ১৯০৪ সালে, হারজেল মারা যান। তবে তাঁর স্বপ্নের মৃত্যু ঘটেনি। ইহুদি আন্দোলন অব্যাহত থাকে। সারা বিশ্বেই ইহুদিরা সংগঠিত হতে থাকে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ফিলিস্তিনে গিয়ে আবাসন গাড়তে থাকে। এরপর শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

অটোমান সাম্রাজ্যসহ 'অক্ষশক্তিকে' পরাজিত করতে 'মিত্রশক্তির' পক্ষে যুক্তরাজ্য তখন ব্যাপক বিধ্বংসী বিস্ফোরকের খোঁজ করছিল। ইহুদি নেতা ড. চেইম ওয়েইজম্যান এই সুযোগ কাজে লাগান। তিনি বেলারুশে জন্মগ্রহণ করলেও ১৯১০ সালে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করেন। পড়াশোনা করেছিলেন রাশিয়া, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে। রসায়নশাস্ত্রে পিএইডি ডিগ্রি লাভ করা এই বিজ্ঞানী শস্যদানা থেকে আবিষ্কার করেছিলেন বিস্ফোরক দ্রব্যের রাসায়নিক উপাদান 'এসিটন'। এই সেই উপাদান, যা যুক্তরাজ্য হন্যে হয়ে খুঁজছিল। ওয়েইজম্যান বিপুল পরিমাণ এসিটন সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর এর বিনিময়ে তিনি আদায় করে নেন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদিদের জাতীয় আবাসন প্রতিষ্ঠা করতে যুক্তরাজ্যের প্রতিশ্রুতি। এর প্রকাশ্য রূপই হলো বেলফোর ঘোষণা। যুক্তরাজ্য কথা দিয়েছিল, অটোমান সাম্রাজ্যের পতন হলে বেলফোর ঘোষণা বাস্তবায়ন করা হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, অটোমান সাম্রাজ্য ও বুলগেরিয়ার পক্ষ পরাজিত হয়। তুরস্কে মুসলিম খিলাফত ভেঙে যায়। ব্রিটিশ বাহিনী ইরাক, সিনাই উপত্যকা, ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম শহর দখল করে নেয়। বেশির ভাগ আরব এলাকা তখন যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের দখলে চলে আসে। আর তখন বেলফোর ঘোষণা বাস্তবায়নের পালা। ফিলিস্তিনে শুরু হয় ইহুদি পুনর্বাসন। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে স্রোতের মতো ইহুদিরা আসতে থাকে। ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইহুদি ছিল মাত্র কয়েক হাজার। কিন্তু ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ সালে এই সংখ্যা ৩৫ হাজারে পৌঁছায়। আর ১৯৩১ সালে তা ১ লাখ ৮০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। ১৯৪৮ সালে ইহুদির সংখ্যা ৬ লাখে পৌঁছায়। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জার্মানি ও হিটলার অধিকৃত অঞ্চলে ইহুদি হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। নাৎসি বাহিনী অন্তত ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদিদের জন্য একটি জাতীয় আবাসন নয়, স্বাধীন রাষ্ট্র জরুরি হয়ে পড়ে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৪৭ সালে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করার একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী, ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ৪৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি আরবদের এবং ৫৫ শতাংশ ইহুদিদের হাতে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আরব ফিলিস্তিনি নেতারা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহুদিরা তখনই দখলে রেখেছিল ৬৭ শতাংশ ভূখণ্ড। অথচ বেলফোর ঘোষণার সময় সেখানে বসবাসরত আরব মুসলিমদের ভোগদখলে ছিল ৯৭ শতাংশ জমি। কিন্তু তাদের সেই ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়। যুক্তরাজ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইহুদি গোষ্ঠীগুলো ১৯৪৮ সালে আরব ফিলিস্তিনিদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায়। সাড়ে ৭ লাখেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে বসতভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য করে। অগণিত ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদে ১৯৪৮ সালের ১৫ মে স্বাধীন ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়া হয়। বিস্ফোরক অস্ত্রের উপাদান সরবরাহকারী সেই রসায়নবিদ ওয়াইজম্যানকে করা হয় দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট। নতুন এই রাষ্ট্রের রাজধানী করা হয় তেলআবিবকে।

তবে জেরুজালেমকেই বরাবর রাজধানী হিসেবে গণ্য করে আসছে ইসরায়েল। আর ফিলিস্তিনিরা মনে করে, পূর্ব জেরুজালেম, যে অংশটি ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের সময় ইসরায়েল দখল করে নিয়েছিল, সেটিই হবে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী। এই পূর্ব জেরুজালেমে এখন প্রায় ৩ লাখ ৩০ হাজার আরব ফিলিস্তিনি এবং ২ লাখ ইহুদি বসবাস করে। অধিকৃত এলাকায় ইহুদি বসতিস্থাপন বন্ধ করতে ফিলিস্তিনিদের জোরালো দাবি ও ইসরায়েলের নাকচের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪ সালে দুই পক্ষের শান্তি আলোচনা ভেস্তে যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় আবার আলোচনা শুরুর চেষ্টা চলছিল। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী স্বীকৃতি দিলেন। ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে শান্তি আলোচনার মৃত্যু হয়েছে আর যুক্তরাষ্ট্র হারিয়েছে মধ্যস্থতাকারীর অধিকার।

ট্রাম্পের ঘোষণার দুই দিন পর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকে ১৪ সদস্য নিন্দা জানিয়েছে। সেদিন যুক্তরাষ্ট্র একঘরে হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত জর্ডানসহ যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোও ট্রাম্পের নিন্দায় মুখর। আর পূর্ব জেরুজালেমে, পশ্চিমতীরে ও গাজায় যেভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে ফিলিস্তিনিরা, তাতে গণ-অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। বেলফোর ঘোষণার জের ফিলিস্তিনিরা ১০০ বছর ধরে টানছে। আজও তারা রাষ্ট্রহীন। এবার ট্রাম্পের ঘোষণার পরিণতি কী হবে, কত মানুষের রক্তপাত ঘটবে, তা একমাত্র সময়ই বলতে পারে। ■

তথ্যসূত্র

১. দ্য গার্ডিয়ান, বিবিসি ও আলজাজিরা

যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রেক্ষিত সাবেক যুগোস্লাভিয়া

বাসবী বড়ুয়া

এই বছরের নভেম্বরে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত (The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia [ICTY]) দুজন সাবেক জেনারেল, ৭৪ বছর বয়সি রাটকো ম্লদিচ এবং স্লোবোডান প্রালজাকের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের আওতায় সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন। এই আদালত ১৯৯০-এর দশকে বলকান অঞ্চলে জাতিগত সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত। জাতিসংঘের সপ্তম চার্টার মোতাবেক নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক এটি গঠন করা হয়। ন্যুরেমবার্গ এবং টোকিও ট্রাইব্যুনালের পরই নির্বিচার মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারে এই আদালতকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ১৯৯৩ সালে গঠিত নানা চড়াই-উতরাইয়ের চার বছর আগে রাদভান কারাদজিচ, রাটকো ম্লদিচের মতো গুরুত্বপূর্ণ হোতাদের গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়। এর পর থেকে ৫৩০ দিনে এই ট্রাইব্যুনাল ৫৯১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং ১০৬টি অপরাধের প্রায় ১০ হাজার নমুনা নিরীক্ষণ করেন। ট্রাইব্যুনাল চারটি ক্ষেত্রে যুদ্ধাপরাধের তদন্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছে জেনেভা কনভেনশন যথাযথভাবে না মানা, যুদ্ধকালীন সময়ের চর্চিত নিয়মনীতি ভঙ্গ করা, গণহত্যা এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। চূড়ান্ত পর্যায়ে ট্রাইব্যুনাল ১৬০ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সরকার প্রধান, প্রধানমন্ত্রী, সামরিক বাহিনীর প্রধান, মন্ত্রীবর্গ, উচ্চ ও মধ্যম সারির রাজনৈতিক, সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর নেতা। বলকান যুদ্ধের দুই প্রভাবশালী অপরাধী রাটকো ম্লদিচ এবং স্লোবোডান প্রালজাকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের রায় এই ট্রাইব্যুনালের শেষ রায়। ট্রাইব্যুনাল যদিও বেশিরভাগ সার্ব এবং বসনিয়ান-সার্বদের অপরাধের শুনানি করেছেন, অপরাপর জাতিগোষ্ঠী ক্রোয়াট, বসনিয়ান মুসলিম এবং কসেভো আলবেনিয়ানদের সার্বদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগও তাঁরা তদন্ত করেছেন।

রাটকো ম্লদিচ ও স্রিবিনিৎচা গণহত্যা

স্রিবিনিৎচা গণহত্যার মূল নায়ক 'বসনিয়ার কসাই' খ্যাত রাটকো ম্লদিচ। ১৯৯১ সালের জুন মাসে সাবেক যুগোস্লাভিয়া থেকে শ্লোভেনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১০ দিনের সংঘর্ষ শেষে সার্ব নিয়ন্ত্রিত যুগোশ্লাভ সেনাবাহিনী শ্লোভেনিয়া থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে। কিন্তু ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে তাদের যুদ্ধ

যুদ্ধাপরাধের বিচারে সাজাপ্রাপ্ত রাটকো ম্লদিচ

১৯৯৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার আরেক প্রদেশ বসনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি দখল করে নেয় সেখানকার সার্বরা এবং তদানীন্তন বসনিয়ান-সার্ব কমান্ডার রাটকো ম্লদিচের তত্ত্বাবধানে সারায়েভো শহর ১ হাজার ৪৬০ দিন অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। এই সময়কালে ১১ হাজার ৫০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে জাতিগত নির্মূল অভিযান পরিচালনা, বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যাসহ ১০টি অভিযোগ আনীত হয়।

জেনারেল ম্লদিচের বাহিনীরা ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে স্রিবিনিৎচা দখল করে নেয় এবং মুসলিম অধ্যুষিত এই শহরের ৮ হাজার পুরুষ এবং বালককে হত্যা করা হয়। ন্যাটোর বোমা বর্ষণের মধ্য দিয়ে এই শহর সার্ব দখলমুক্ত হয়। আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত স্রিবিনিৎচা গণহত্যার বাস্তবতায় ম্লদিক এবং বসনিয়ান-সার্ব নেতা রাদোভান কারাদজিচের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে। ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে ডেইটন চুক্তির মধ্য দিয়ে বসনিয়ার ভূখণ্ডে দুই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠন করা হয়; একটি বসনিয়ান-সার্ব এবং আরেকটি মুসলিম ক্রোয়াট রাজ্য। ১৯৯৭ সালে আন্তর্জাতিক আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলেও ম্লদিককে আন্তর্জাতিক চাপে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় ২০১১ সালে। স্রিবিনিৎচা গণহত্যা প্রমাণে ট্রাইব্যুনাল অসাধারণ পরিপক্বতা প্রদর্শন করে। ট্রাইব্যুনালের তদন্তকারীরা বিভিন্ন ধরনের সাক্ষ্যপ্রমাণ জড়ো করে। এর মধ্যে ছিল যুদ্ধে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের সাক্ষ্য, স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি, গণকবর উদ্ধারে প্রত্নতত্ত্ববিদ, নৃবিজ্ঞানী, বিশেষ ডগ স্কোয়াড এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত দল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কবর থেকে মৃতদেহ উত্তোলন করে পরীক্ষা করা।

স্লোবোডান প্রালজাকের আদালতে বিষপান : বসনিয়ান-ক্রোয়াট যুদ্ধ অপরাধী স্লোবোডান প্রালজাক আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে সেখানেই বিষপান করেন এবং হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরপরই গার্ডিয়ান ও অবজারভার-এর সাংবাদিক এড ভুলিয়ানি জেনারেল প্রালজাকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত কথোপকথনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি নিবন্ধ লেখেন। সাংবাদিক ভুলিয়ানিকে আদালতে একজন সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসেবে জেনারেল প্রালজাক জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ পান। তাঁর সঙ্গে প্রথম অভিজ্ঞতার বরাত দিয়ে ভুলিয়ানি লেখেন, ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রালজাক তখন স্বঘোষিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র 'হারজেগ-বসনিয়া'র সর্বময় কর্তা। ভুলিয়ানি ছিলেন তিনজন সাংবাদিকদের একজন, যাঁদের প্রালজাক বসনিয়ান ক্রোয়াটদের শক্ত ঘাঁটি

কাপলিনজার নিকটে ড্রেটেলজ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ঢোকার অনুমতি দেন। এই ক্যাম্পটি ইতিমধ্যে বসনিয়ান মুসলমান পুরুষদের প্রতি নির্যাতন এবং অনাহারে মৃত্যুর জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে। প্রালজাক সেই ধরনের নেতাদের মতোই যাঁরা চেয়েছিলেন নিজেদের বসতি হবে ethnically clean। সাংবাদিকরা সে সময় ক্রোয়েশিয়ান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কো তুজম্যানের লেখা এক চিঠিতে বসনিয়ার যেসব ক্যাম্পে মুসলমানদের বন্দি করে রাখা হয়েছে সেখানে জেনেভা কনভেনশন মানা হচ্ছে না, এরকম একটি খবর পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং সে মোতাবেক দ্রেতেলজের বন্দিশিবিরে বারবার ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। ভুলিয়ানি বলেন, সেখানকার ভারপ্রাপ্ত মেজর সাকোটা বিষয়টি একদমই পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু প্রালজাকের নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়েই সাংবাদিকদের ক্যাম্পটি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন। এর পরের দৃশ্য ভয়াবহ নারকীয়। একটি গুদামঘরে শত শত ভয়ার্ত মানুষ বসে অথবা কুঁজো হয়ে পড়ে আছে, যে ঘরের দরজা ৭২ ঘণ্টার বেশি বন্ধ ছিল। বন্দিদের অসহ্য গরমে শ্বাসরুদ্ধকর পূতিগন্ধময় জায়গায় নিজেদের মূত্রপান করতেও হয়েছিল। সাংবাদিকরা এরপরের যে কক্ষে যান তার দরজা খোলাই ছিল, কিন্তু ভিতরে গভীর অন্ধকার। বন্দিরা সেখানে ভীতিজনক পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে জানালেন, কীভাবে এক রাতে মাতাল প্রহরীরা বন্দিদের ভেতরে গুলি চালিয়ে দেয়, যেখানে আহত ও মৃত্যুবরণ করেন অনেকেই। এই বন্দিরা ছিল কঙ্কালসার, তাদের দৃষ্টি ছিল শূন্য এবং বেশিরভাগই চর্মরোগে আক্রান্ত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই মুসলমানদের অনেকেই প্রালজাকের বাহিনীর সদস্য হিসেবে সার্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

সামনের পথ: রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিল ফিক্রেট এলিচ, ট্রাইব্যুনালের অন্যতম সাক্ষী। চরম নির্যাতনের শিকার এই বসনিয়ানের হাড্ডি-চর্মসার ছবি সে সময় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বিশ্ব জানতে পারে এই যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে। এলিচ ছিল বসনিয়ার ছোট শহর কোজারাকের অধিবাসী, যার অধিকাংশ মানুষ নির্যাতন এবং হত্যার শিকার হন। সাংবাদিক ভুলিয়ানির ভাষায় সার্বরা চেয়েছিল এই ছোট্ট শহরটিকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দিতে। বর্তমানে এই শহরটির পুনরুত্থান ঘটেছে শরণার্থী হিসেবে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেয়া বসনিয়ানদের পাঠানো অর্থে।

দীর্ঘ সময় পরে হলেও আদালতের এই রায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের নামে গণহত্যা পরিচালনা-কারীদের জন্য একটি বার্তা হতে পারে। ইতিমধ্যেই জাতিসংঘ নিম্নস্বরে হলেও মিয়ানমারে চলমান রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নির্বিচারে গণহত্যার আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার হতে পারার সম্ভাবনার কথা বলছে। রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ উপেক্ষা করে অদূর ভবিষ্যতে এর বাস্তবায়ন মানবাধিকার কর্মীদের আরো আশাবাদী করবে।■

তথ্যসূত্র

১. Ed Vulliamy, "The day I came face to face with General Pralzak in the Hague", 29 November, 2017, দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা
২. www.icty.org

মধ্যপ্রাচ্যে নির্যাতিত হচ্ছেন বাংলাদেশি নারী গৃহশ্রমিক

শান্তা ইসলাম

শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, বিশেষত যৌন নিপীড়নের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১তে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কা সৌদি আরবে তাদের দেশের নারীদের পাঠানো বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে দেশটি বাংলাদেশ থেকে নারী গৃহকর্মী নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তখন কর্মস্থলে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত না করে সৌদি আরবে নারীদের না পাঠানোর ব্যাপারে মত দেয় অভিবাসন ও নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন। তাদের উদ্বেগ উপেক্ষা করেই সে সময় সৌদি আরবে নারী গৃহকর্মী পাঠানো শুরু করে বাংলাদেশ সরকার। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মানসম্মত কাজের নিশ্চয়তা বিধানে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের সে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে; এ ছাড়া তাঁরা যাতে কোনো ধরনের সমস্যায় না পড়েন সেদিকে খেয়াল রাখা হবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন কথা বলছে।

২০১৭-র আগস্টে এ রকম তিনজন অসহায় নির্যাতিত নারী আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর সহযোগিতায় দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হন। সংগত কারণে পরিচয় গোপন রেখে ও ছদ্মনামে এখানে তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে।

কেস স্টাডি ১

চার সদস্যের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ফাতেমা বেগম (২০)। তাঁর বাড়ি যশোর জেলায়, কাজ করতেন গাজীপুরের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে। গার্মেন্টসে কর্মরত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় কয়েকজন দালালের। তাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি বিদেশে যাবার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। দারিদ্র্য ও ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পেতে তিনি বিদেশে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত নেন। সেই দালালদের সহযোগিতায় ঢাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি জনশক্তি রপ্তানি সংস্থার মাধ্যমে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে ১৭ জুলাই ২০১৭ তারিখে তিনি সৌদি আরবের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তবে তাঁর স্বপ্ন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। প্রথম দিন রাতেই গৃহকর্তা তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। তিনি পালিয়ে বাথরুমে আশ্রয় নেন। কিন্তু এরকম ঘটনা বারবার ঘটতেই থাকে। প্রতিদিন খাবার দেয়া হতো এক বোতল পানি ও এক ধরনের শক্ত রুটি। খাবার চাইলে মারধর করা হতো। এরপর তিনি কাজ করা বন্ধ করে দেন এবং তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। একপর্যায়ে সে বাড়ির গৃহকর্তা তাঁকে বিদেশি নারী

শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনাকারী স্থানীয় এক অফিসে রেখে আসে, যাকে তারা 'মক্তব' হিসেবে সম্বোধন করে। সেখান থেকে তাঁকে আরেকটি বাড়িতে পাঠানো হয়। সেখানেও তিনি একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। দিনের পর দিন তাঁকে অভুক্ত রাখা হয়। সেখানে তিনি প্রচণ্ড রকমের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। সে বাড়িতেই তাঁর পরিচয় হয় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে যাওয়া আরো দুই বাংলাদেশি নারীর সঙ্গে। তাঁরা জানান যে, একই ধরনের সমস্যায় তাঁরাও রয়েছেন। কাজ ছাড়া বাকি সময় তাঁদের একসঙ্গে একটি ঘরে বন্দি করে রাখা হতো। কিন্তু ফাতেমা হাল ছাড়েননি। মোবাইলের মাধ্যমে তিনি তাঁর পরিস্থিতির কথা তাঁর ভাইকে জানান। তাঁর ভাই স্থানীয় মানবাধিকার কর্মী আব্দুর রহমানের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাইলে তিনি আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আসক ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিডিও কলে ফাতেমা ও তাঁর সঙ্গের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন। পরবর্তী সময়ে আসক-এর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অ্যাম্বাসির কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে তারা ফাতেমা ও তাঁর সঙ্গে থাকা নির্যাতিত মেয়েদের উদ্ধারে উদ্যোগী হয়। অবশেষে, ১২ আগস্ট ২০১৭ তিনি দেশে ফিরে আসেন। আসক-এর সঙ্গে এক আলোচনায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, তাঁর মতো আর কোনো মেয়ে যাতে সৌদি আরবে গিয়ে নির্যাতনের শিকার না হন, এজন্য আসক কোনো উদ্যোগ নিলে তিনি সেখানে কাজ করতে চান। তিনি তাঁর দুরবস্থার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

কেস স্টাডি ২

তিন সন্তানের মা, মাজেদা বেগমের বাড়ি ভোলা জেলায়। তাঁর ইলেকট্রিক মিস্ত্রি স্বামীর আয়ে সংসার চালানো দুরূহ হয়ে পড়লে সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে এভিয়েত ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি জনশক্তি রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এমনকি ভালো বাড়িতে কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা বাড়তি টাকাও নেয়। অবশেষে, গত ২৩ জুন ২০১৭ তিনি সৌদি আরব রওনা হন। কিন্তু সৌদি আরব পৌঁছানোর কিছুদিনের মধ্যে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। তাঁকে যে বাড়িতে কাজ করতে পাঠানো হয়, সে বাড়ির পুরুষ সদস্যরা বারবার তাঁকে হয়রানি করতে থাকে। ধর্ষণের চেষ্টা ঠেকাতে গেলে বাড়ির মালিক তাঁকে প্রচণ্ড মারধর করে। এ ব্যাপারে বাড়ির মহিলাদের সহযোগিতা চাইলেও কোনো লাভ হয়নি। তাঁকে দেশে যোগাযোগ করতে দেয়া হতো না, এমনকি তাঁর মোবাইল ফোনটিও বাড়ির ভেতর থেকে হারিয়ে যায়। তাঁকে নিয়মিত খেতে দেয়া হতো না, খাবার চাইলেও নির্যাতন করা হতো। এর মধ্যেও তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তৈরি করে নেন। তিনি তাঁর দুরবস্থার কথা তাঁকে জানান। তাঁর স্বামী এভিয়েত ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা উলটো তাঁকে হুমকি-ধমকি দিতে থাকে। এরপর তিনি কাজ করা বন্ধ করে দিলে সে বাড়ির লোকেরা তাঁকে 'মক্তব' অফিসে রেখে আসেন। সে অফিসে বিভিন্ন দেশের নারীদের সঙ্গে তাঁকেও শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। তিনি দেশে ফিরতে চাইলে তারা জানায় যে, তাঁকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে এবং তিনি তাদের কথা শুনতে বাধ্য। এরপর তাঁকে আরেকটি বাড়িতে পাঠানো হয়। কিন্তু সে বাড়িতেও পরিস্থিতি বদলায় না। অত্যাচারের এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, সেখান থেকে লুকিয়ে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন। এরপর তাঁর স্বামী সৌদিতে অবস্থানরত তাঁর এক বন্ধুর কাছে সাহায্য চান। তাঁর বন্ধু তখন মাজেদাকে খুঁজে বের করেন এবং তাঁর একটি ছবি তুলে দেশে তাঁর স্বামীকে পাঠান। তিনি তখন সেই ছবিসহ আবারও এভিয়েত ইন্টারন্যাশনালে যোগাযোগ করলে তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে ৩ লাখ টাকা দাবি করে তারা। বারবার হয়রানির শিকার হয়ে তিনি রমনা থানায় জিডি করেন, পাশাপাশি তিনি আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর কাছে তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা চেয়ে আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আসক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অ্যাম্বাসির কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অ্যাম্বাসি ও আসক-এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তিনি ১২ আগস্ট ২০১৭ দেশে ফিরে আসতে সমর্থ হন। তবে এখনো তিনি শারীরিক-মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা বলতে গিয়ে তিনি বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন।

কেস স্টাডি ৩

সৌদি প্রবাসী চাচার বারংবার নিষেধ উপেক্ষা করেও দুই সন্তানকে একটি সচ্ছল জীবন দেবার আশা নিয়ে সৌদি আরব পাড়ি জমান ঢাকার দোহারের সোনিয়া আক্তার। মেয়েকে বিয়ে দেয়া, ছেলের কথা বলতে সমস্যা দূর করার জন্য চিকিৎসা খরচ জোগাড় করতে তাঁর কাছে এর চেয়ে ভালো কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু সৌদি আরব পৌঁছানোর ছয় সপ্তাহের মাথায় তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। নির্যাতনের মুখে তিনি কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালে তারা তাঁকে 'মক্তব'-এ রেখে আসে। সেখান থেকে তাঁকে আবার অন্য একটি বাড়িতে বিক্রি করে দেয়া হয় বলে তিনি জানান। অত্যাচার থেকে বাঁচতে তিনি সেখান থেকে দুইবার পালিয়ে স্থানীয় থানায় আশ্রয় নেন। কিন্তু প্রতিবার তাঁকে দেশে পাঠানোর আশ্বাস দিয়ে সে বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। এ অবস্থা মেনে নিতে না পেরে তিনি আবারও পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তাঁকে ১৫ দিন থানা হাজতে আটক রাখা হয়। এরপর তাঁকে আবারও মক্তবে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় ফাতেমাসহ আরো বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি নারীর সঙ্গে। তাঁরাও অত্যাচারের শিকার হয়ে দেশে ফেরার চেষ্টা করছিলেন। ফাতেমার মাধ্যমে তিনি তাঁর অবস্থার কথাও আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-কে জানান। এরপর আসক তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু কিছু পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে তাঁর দেশে ফিরতে অন্যদের চেয়ে বেশি সময় লাগে।

এই তিনজন নারীর সঙ্গেই আলোচনায় জানা যায়, অনেকেই তাঁরা সৌদি আরবে গিয়ে এরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে পারে জেনেও দালালদের প্ররোচনায় ও সুন্দর সচ্ছল ভবিষ্যতের স্বপ্নে

বিভোর হয়ে বিদেশের পথে পা বাড়ান। নিজেদের ভাগ্য বদলাতে এর চেয়ে ভালো সুযোগ তাঁদের কাছে ছিল না। অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অনেকেই নির্যাতনের শিকার। গত ১৮ নভেম্বর ২০১৭ বেসরকারি সংগঠন ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং ও নিজেরা করির উদ্যোগে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে 'কেমন আছেন অভিবাসী নারী শ্রমিকেরা?' শীর্ষক গণশুনানিতে এ তথ্য উঠে আসে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির গুরুত্ব কোনোভাবেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কিন্তু এসব কথা ভাবতে গিয়ে আমরা আমাদের মেয়েদের এমন বিপদের দিকে ঠেলে দিতে পারি কি না, তা উপলব্ধি করার সময় হয়েছে। ■

মেয়ে শিশুদের নিরাপত্তা ও বাস্তবতা

আসমা খানম রুবা

বাংলাদেশ যখন বিশ্বের দরবারে অর্থনৈতিক সূচকসহ নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার উন্নয়ন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দৃঢ় করছে, ঠিক সে সময়ে এ দেশেই আবার নারীদের প্রতি সহিংসতা আর যৌন নির্যাতনের হার ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। জানুয়ারি থেকে অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকার ভিত্তিতে তৈরি আসক-এর তথ্যসংরক্ষণ ইউনিটের তথ্যসূত্রে জানা যায়– এই সময়ে নারীর প্রতি অন্যান্য সহিংসতার পাশাপাশি মেয়েশিশুদের প্রতি যৌন নির্যাতন পূর্বের বছরের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই সূত্র ধরে আইন সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় যাদের জন্য আসক আইন সহায়তা প্রদান করে আসছে, তাদের মধ্যে ধর্ষণের শিকার দুজন কিশোরীর বর্তমান অবস্থা এখানে তুলে ধরা হলো।

গত ২৭ এপ্রিল ২০১৭, জনৈক পিতা ধর্ষণের শিকার তার ১৩ বছরের অন্তঃসত্ত্বা কন্যার নিরাপদ আশ্রয় এবং মামলা দায়েরের আইনগত সহায়তা চেয়ে আসক এ আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে জানা যায়– সিরাজগঞ্জে তার স্থায়ী নিবাস নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় তিনি তাঁর চার সন্তানকে নিয়ে ভাইয়ের কাছে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার এক গ্রামে চলে আসেন। কিন্তু অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে অন্যের বাড়িতে সন্তানদের নিয়ে তিনি বসবাস করতেন। তার দুই ছেলে এবং দুই মেয়ের মধ্যে ধর্ষণের শিকার উক্ত মেয়েটি তাঁর তৃতীয় সন্তান, যার বয়স ১৩ বছর। তাঁর উক্ত কন্যা প্রতিবেশী এক ব্যক্তির অসুস্থ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত বৃদ্ধা মায়ের সেবা-যত্ন করত এবং তার ঘরে রাতে থাকত। গত নভেম্বর ২০১৬-এর কোনো এক রাতে উক্ত চল্লিশোর্ধ্ব প্রতিবেশী তার মায়ের রুমে ঢুকে উক্ত কিশোরীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ধর্ষণ করে এবং বিষয়টি কাউকে না বলার জন্য হুমকি দেয়। যার ফলে মেয়েটি ভয়ে কাউকে কিছু জানাতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে শারীরিক পরিবর্তনের ফলে তার অন্তঃসত্ত্বা হবার বিষয়টি সকলের জানাজানি হলে তিনি এ বিষয়ে আইনি সহযোগিতাসহ নিরাপদ আশ্রয় এবং প্রসব পূর্ব ও পরবর্তী সহায়তা চেয়ে আসক-এ আবেদন করেন।

পিতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আসক-এর সহায়তায় গত ৯ মে ২০১৭ তারিখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, সংশোধনী ২০০৩-এর ৯(১) ধারায় দেলদুয়ার থানা, টাঙ্গাইলে মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ আসামিকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে প্রেরণ করে। টাঙ্গাইলে আসক হতে প্যানেল ল'ইয়ারের মাধ্যমে মামলাটি পরিচালনা করা হচ্ছে। তা চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে গত ২৬ আগস্ট ২০১৭ তারিখে উক্ত কিশোরী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। গত ২৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে উক্ত নবজাতক শিশুটির ডিএনএ টেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি আদালতে পেশ করার পরে পরবর্তী বিচার কার্যক্রমে আসকের সহযোগিতা চলমান থাকবে। নবজাতক সন্তানসহ ভিকটিম কিশোরী মেয়েটিকে আইনগত সহযোগিতা, আশ্রয় এবং প্রসব-পরবর্তী সেবা প্রদানসহ আসক সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে।

গত ১৭ জুলাই ২০১৭ তারিখে দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'শিশু সন্তানকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেফতার' শীর্ষক একটি খবর। পত্রিকা পড়ে এবং স্থানীয় এক আইন শিক্ষার্থীর মাধ্যমে জানা যায়– ভিকটিমের মা বাদী হয়ে গত ১৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে মেয়ের বাবা অর্থাৎ তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, সংশোধনী ২০০৩-এর ৯(১) ধারায় মামলা দায়ের করেছেন। এবং সেদিনই পুলিশ আসামিকে গ্রেফতার করেছে। বাদীর কাছ থেকে জানা যায়, তাঁর এবং আসামির দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। তাদের বড় সন্তান অর্থাৎ ভিকটিম গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যায়নরত। দীর্ঘ প্রায় ১১/১২ বছরের ব্যবধানে তিনি পুনরায় অন্তঃসত্ত্বা হলে শারীরিক অসুস্থতার কারণে বড় মেয়েকে বাবার কাছে নিজ বাড়িতে রেখে তিনি তাঁর মায়ের বাড়িতে যান। তাঁর স্বামী বেশির ভাগ সময়ই গভীর রাতে বাসায় ফিরত। তাঁদের দ্বিতীয় কন্যার জন্মগ্রহণের পরে বাড়িতে ফিরে তাঁদের বড় মেয়ের শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ করেন। পরবর্তী সময়ে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন। তিনি প্রতিবেশী এবং মেয়ের স্কুলের শিক্ষকদের সহায়তায় থানায় গিয়ে এ বিষয়ে মামলা দায়ের করেন। ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা উক্ত ভিকটিম কিশোরীকে (১২) আদালত মামলার বাদী অর্থাৎ মায়ের জিম্মায় প্রদান করেছেন। গত ১৯ জুলাই ২০১৭ তারিখে মামলার বাদী তাঁর ও তাঁর মেয়ের নিরাপত্তাহীনতার কারণে উভয়ের নিরাপদ আশ্রয় এবং অন্তঃসত্ত্বা কিশোরী মেয়ের নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য আসক-এর নিকট আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে গত ২০ জুলাই ২০১৭ তারিখে আসক আইনজীবী জামালপুরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

আদালতে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় আইনজীবীর সহায়তায় জিম্মা শুনানি শেষে ভিকটিম ও তাঁর মাকে আসক-এর জিম্মায় নিয়ে আসেন এবং আসক শেল্টারহোমে তাদের নিরাপদ আশ্রয়সহ অন্তঃসত্ত্বা উক্ত ভিকটিমের নিরাপদ প্রসব-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে উক্ত ভিকটিম কিশোরী একটি পুত্রসন্তান জন্ম দেয়। মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তার সঙ্গে আসক নিয়মিতভাবে যোগাযোগ করছে এবং মামলার বাদী ও ভিকটিমকে নিরাপদ আশ্রয়, মনঃসামাজিক সহায়তাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

উপরোক্ত ঘটনা দুটোতে লক্ষণীয় যে, প্রথম কিশোরীটির ক্ষেত্রে দরিদ্র বাবার আশ্রয়হীনতার কারণে বাধ্য হয়ে তাকে দুষ্কৃতকারীর নাগালের মধ্যে যেতে বাধ্য হতে হয়েছে। ফলে তাকে মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় কিশোরীর ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী তুলনামূলক বেশি নিরাপদ আর সুরক্ষিত আশ্রয়ে থেকেও তাকে ভয়ংকর এই পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে। বর্তমানে তার মা অর্থাৎ মামলার বাদী তার পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের বিষয়ে এবং তারই কন্যার গর্ভে তার স্বামীর ঔরসজাত শিশুপুত্রকে নিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তাঁর এবং তাঁর এই কিশোরী কন্যা ও নবজাতক এই শিশুটির ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় দিশেহারা। তাহলে সমাজে মেয়েশিশুদের নিরাপত্তা কোথায়? ধর্ষণের ফলে তাদের গর্ভে জন্ম নেয়া এসব শিশুদেরই-বা সামাজিক অথবা পারিবারিক অবস্থান কী? প্রশ্নগুলো কেবলই ঘুরপাক খেতে থাকে। ■

ধর্ষণ ও শিশু নির্যাতনের পরিসংখ্যান, ২০১৭ (জানুয়ারি-নভেম্বর)

ধর্ষণ ২০১৭ (জানুয়ারি-নভেম্বর)

বয়স / ধরন	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উল্লেখ নেই	মোট	হত্যা	আত্মহত্যা	মামলা	মামলার উল্লেখ নেই
ধর্ষণের চেষ্টা	১৪	১৮	১২	৩	৬	০	৪৪	৯৭	০	১	৫৩	৪৪
একক ধর্ষণ	৫১	১১৯	১১৯	১২	৪	৬	২৩২	৫৪৩	১৭	৬	৩৪৭	১৯৬
গণধর্ষণ	০	১২	৫১	১৩	৭	৫	৯৮	১৮৬	১৩	৫	১২৩	৬৩
ধর্ষণের ধরন উল্লেখ নেই	২	১	০	০	২	৩	১২	২০	৯	০	১১	৯
মোট	**৬৭**	**১৫০**	**১৮২**	**২৮**	**১৯**	**১৪**	**৩৮৬**	**৮৪৬**	**০**	**০**	**৫৩৪**	**৩১২**
ধর্ষণ-পরবর্তী হত্যা	৩	৬	১০	১	৬	৭	৬	০	৩৯	০	০	০
ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা	০	০	৬	১	০	০	৫	০	০	১২	০	০

শিশু নির্যাতন ২০১৭ (জানুয়ারি-নভেম্বর)

বয়স / নির্যাতনের ধরন	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা
নির্যাতন	৮৭	১৬৮	২০৮	৪৫৮	৯১২	৪২৪
নিখোঁজ	৩	১৪	১৬	৩	৩৬	০
পাচার/ পাচারের চেষ্টা	০	২	০	০	২	০
অপহরণ	২	৩	৫	৯	১৯	৬
পরিত্যাক্ত বোমা বিস্ফোরণ	০	০	৫	০	৫	০
মোট	৯২	১৮৭	২৩৪	৪৭০	৯৮৩	৪৩০

শিশু হত্যা ২০১৭ (জানুয়ারি-নভেম্বর)

বয়স / ধরন	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা
হত্যা	৯৭	৭৪	১১৫	২৩	৩০৯	১৩৪
আত্মহত্যা	০	২০	৭২	১৯	১১১	২৯
লাশ উদ্ধার	৩৯	২৫	৪৩	১২	১১৯	১৪
রহস্যজনক মৃত্যু	১	১৬	১৮	০	৩৫	১০
মোট	১৩৭	১৩৫	২৪৮	৫৪	৫৭৪	১৮৭

* ওপরের পরিসংখ্যানে বর্ণিত শিশু নির্যাতনকারী ও হত্যাকারী হচ্ছে: গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী, দুষ্কৃতিকারী, বখাটে, শিক্ষক, পরিবারের সদস্য, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং পাড়া-প্রতিবেশী

* শিশুদের আত্মহত্যার কারণ ছিল বখাটে কর্তৃক উত্ত্যক্ত, শিক্ষক কর্তৃক নির্যাতন।

সূত্র: প্রথম আলো, সংবাদ, ইত্তেফাক, সমকাল, নয়া দিগন্ত, ডেইলি স্টার, নিউ এইজ, ঢাকা ট্রিবিউন ও আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট।